

E-MAGAZINE

CHEMQUEST

2 AUGUST, 2020

ISSUE NO. 1

ON
THE
OCASSION
OF
159TH

*BIRTH
ANNIVERSARY OF
ACHARYA PRAFULLA CHANDRA RAY*

EDITORIAL BOARD

DR SUCHANDRA CHATTERJEE

DR HARISADHAN GHOSH

CHEMISTRY DEPARTMENT

SURENDRANATH COLLEGE

24/2 M. G. ROAD, KOLKATA-700009



Preface

Every year on 2nd August, we celebrate the birth anniversary of the notable Indian chemist and revolutionist Sir P. C. Ray, the Father of Indian Chemistry, in our Department with great enthusiasm. Our beloved students observe this day, by publishing a volume of our Wall Magazine “**RASAYANEE**” with innovative writings, beautiful drawings dedicated to Acharyadeb. Our Principal Dr. Indranil Kar and faculty members from different departments join the publication ceremony and motivate our students on this day, that definitely boost up their scientific and creative spirit.

However, due to this COVID-19 created pandemic situation, this year we were not able to celebrate this day in the traditional way. As you all know, now we all are trying to cope with the “New Normal”. In this difficult situation, to keep up the high spirit of our enthusiastic students, we decided to celebrate the day this year in a different manner.

It was actually our long cherished desire to publish a departmental E-Magazine and this time we have utilised this golden opportunity and decided to launch that dream E-Magazine of ours “**CHEMQUEST**” on the occasion of 159th Birth Anniversary of Sir P. C. Ray. We have a future plan to continue publishing at least two issues of this magazine every year. The primary focus of course would be to nurture the creative minds of the young students of our department. We owe to our Principal sir for all his inspiration and motivation to think differently as always.

As we planned this publication very recently, our students actually got very little time to submit their materials but we are surprised to find that even within this short period of time, they came up with some really excellent writings and drawings. Lots of love to them. We believe that you would all just love the contents and enjoy reading this first issue of **CHEMQUEST**.

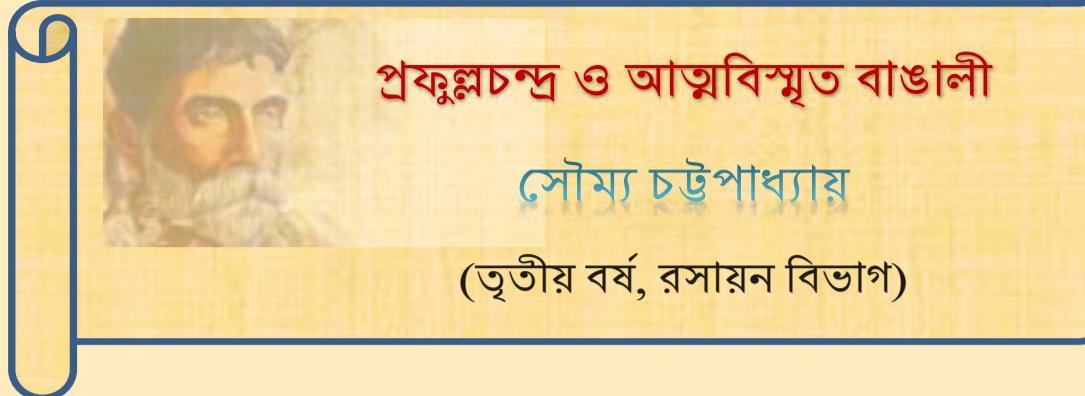
All stay safe and healthy! Enjoy reading!



Editors

INDEX

Authors	Title	Pages
সৌম্য চট্টপাধ্যায়	প্রফুল্লচন্দ্র ও আত্মবিস্মৃত বাঙালী	1-5
সুকল্যাণ চ্যাটার্জী	“অচেনা প্রফুল্লচন্দ্র”	6-8
কৌশিক ভগৎ	“অধ্যাপক প্রফুল্ল চন্দ্র”	8-10
চয়নিকা রায়	“বিজ্ঞান ও সাহিত্য সাধনায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়”	10-11
অভিষেক বল্লভ	মানবকল্যাণে অগ্রদূত	11-13
সুমিত জানা	“প্রফুল্ল চন্দ্র ও প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চা”	13-15
বিভাবরী ঘোষ	“প্রফুল্লচন্দ্র রায়: বিজ্ঞানী, শিক্ষক এবং পথপ্রদর্শক”	16-17
ভূমিকা প্রামাণিক	“সাহিত্যানুরাগী বিজ্ঞানাচার্য”	17-19
নাতাসা সুলতানা	“প্রফুল্লচন্দ্র: আমার আদর্শ”	19-20
Akash Pal, Tirtha Chakrabarti Esha Sinha	Prafulla Chandra Ray- “The Father of Indian Chemistry”	21-22
Prince Saha	“P. C. RAY THE PATRIOT AND A SCIENTIST”	22-25
Arghadeep Sarkar	“Introspection to the contributions of Acharya Prafulla Chandra Ray”	25-27
Rajdeep Chakraborty	Prafulla Chandra Ray: ‘The Revolutionary in the Grab of a Scientist’	27-29
Samik Mal, Sritama Chatterjee, Shyamsundar Maity Suman Mahato	Drawings	30



প্রফুল্লচন্দ্র ও আত্মবিশ্বৃত বাঙালী

সৌম্য চট্টপাধ্যায়

(তৃতীয় বর্ষ, রসায়ন বিভাগ)

রসায়নের ক্লাস চলছে। ছাত্রদের সামনে এক টুকরো হাড় হাতে নিয়ে বুনসেন বার্নারে পুড়িয়ে মুখে পুরে দিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ছাত্রদের শেখালেন, এটা নিছকই ক্যালসিয়াম ফসফেট, এর বাইরে কিছু নয়। এমনকি কোন প্রাণীর হাড় তাও আর চেনার উপায় নেই! রসায়ন দিয়ে শুধু রসায়ন শিক্ষাই নয়, ছাত্রদের মনে ধর্মান্ধতার মূল উপড়ে ফেলার মন্ত্রটিও প্রবেশ করিয়ে দিতেন তিনি অনায়াসে।

যেটুকু দরকার, তার বাইরে কতটুকুই বা পড়ার আগ্রহ আছে আমাদের বইবিমুখ আগামীর? অথচ, বই পড়ার আগ্রহ থেকেই জন্ম নিয়েছিল এই বাঙালি মনীষ। নিজের সফলতাকে পোঁছে দিতে পেরেছিলেন তিনি সার্থকতার শিখরে।

১৮৬১, ২ অগস্ট অবিভক্ত বাংলাদেশের রাডুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন প্রফুল্লচন্দ্র। প্রপিতামহ মানিকলাল রায় ছিলেন নদিয়া (কৃষ্ণনগরের) ও যশোরের কালেক্টরের দেওয়ান। পিতামহ আনন্দলাল রায় ছিলেন যশোরের সেরেন্টাদার। পিতা হরিশচন্দ্র রায় ও মাতা ভুবনমোহিনী দেবী।

বয়েস যখন ৭-৮ তখনই মনে তাঁর অনেক প্রশ়াঁ। মেঘ ডাকে কেন, বৃষ্টি হয় কেন, মানুষ মরে কেন? মা উত্তর দিতে হিমশিম একেবারে! বাবা মায়ের সেই ছোট ফুলুই পরবর্তীতে হয়ে ওঠেন ‘মাস্টার অফ নাইট্রাইটস’ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

এ নামের ইতিহাস অনেকেই হয়তো জানেন। তবু বলে রাখি ছোট করে,
আসলে তিনি বানাতে চেয়েছিলেন মারকিউরিক নাইট্রাইট, ক্যালোমেল বানানোর উপাদান হিসেবে। খানিক
অপ্রত্যাশিতভাবেই তৈরি করে ফেলেন মারকিউরাস নাইট্রাইট। এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষারীয় ও ক্ষারীয় মৃত্তিকা মৌল এবং
সোনা, রূপো, তামার ও নাইট্রাইট তৈরি করেন তিনি। তাঁর ১৬০ এর বেশি গবেষণাপত্র আছে যার মধ্যে ৬০ টিরও
বেশি নাইট্রাইট নিয়ে। তাই তিনি তো তিনি মাস্টার অফ নাইট্রাইটস!

কেমন ছিল তাঁর জীবন পথ? নিজ গ্রামে পিতার প্রতিষ্ঠিত স্কুলেই তাঁর শিক্ষার সূচনা। পিতা পুত্রের সম্পর্ক ছিল বন্ধুর
মতোই। বই পড়া অপেক্ষা পিতার সঙ্গে কথা বলেই অনেক বিষয় যেন বেশি করে শিখতেন। ১৮৪৬ সালে সদ্য
প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণনগর কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ, ক্যাপ্টেন ডি এল রিচার্ডসনের লেখা ‘ব্রিটিশ কবিগণের জীবনী’ বইটি
তিনি পান তাঁর পিতার কাছ থেকে। এটাই ছিল তাঁর অমূল্য পৈতৃক সম্পদ!

১৮৭০ সালে সপ্রিবার চলে আসেন কলকাতায়। ভর্তি হন হেয়ার স্কুলে। রাত জেগে পড়াশোনা করার ফলে আজীবনের সঙ্গী হয় হজমের সমস্যা ও রক্ত আমাশয়। ফিরে যেতে হয় নিজের গ্রামে। এই অসুস্থতাই ছিল তাঁর জীবনে এক ছদ্মবেশী-আশীর্বাদ যেন। গ্রামে এসে অনেকখানি সময় কাটাতেন তিনি পিতার তৈরি লাইব্রেরিতে। বাঁধাধরা বইয়ের বাইরে, শেক্সপিয়ার, এমার্সন, কার্লাইল, ডিকেন্সের রচনা, নিউটন, গ্যালিলি, ফ্রাঙ্কলিনের জীবনী, বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি ইচ্ছেখুশি বই পড়ার আনন্দে মেতে উঠলেন তিনি। স্যর উইলিয়াম জোন্সের প্রশ্নের উত্তরে জোন্সের মায়ের উক্তি ‘পড়িলেই সব জানিতে পারিবে’ কথাটি প্রফুল্লচন্দ্রের মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করে। এরপর ১৮৭৩ সালে আবার সুস্থ হয়ে ফিরে আসেন কলকাতায়। ভর্তি হন অ্যালবার্ট স্কুলে। এরপর এন্ট্রান্স পাশ করে ভর্তি হন মেট্রোপলিটনে। কারণ বিদ্যাসাগরের এই কলেজটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হওয়ায় সেটি তাঁর ‘নিজের’ বলে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, ভারতে প্রথম এই প্রতিষ্ঠানটিই উচ্চশিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষার মতো সুলভ করার সাহসী প্রচেষ্টা দেখায়। এরপর বিদ্যাসাগর কলেজে তিনি বি এ ক্লাসে ভর্তি হন। এই সময় অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এর সান্নিধ্যে তাঁর মধ্যে জেগে ওঠে দেশাত্মবোধ।

কিন্তু এফ.এ পড়ার সময় থেকেই প্রেসিডেন্সি কলেজে 'বাইরের ছাত্র' হিসেবে অধ্যাপকদের রসায়ন বিষয়ে বক্তৃতা শুনতে যেতেন তিনি। জানার আগ্রহ ছিল প্রবল। ইংরাজি সাহিত্যানুরাগী প্রফুল্লচন্দ্র শেষে কিন্তু বিজ্ঞানের আনুগত্য স্বীকার করে নেন, প্রেসিডেন্সির বিখ্যাত প্রফেসর আলেকজান্ডার পেডলারের সান্নিধ্যে এসে। নিজ গৃহেই গড়ে তোলেন তাঁর নিজের ছোট গবেষণাগার।

পরবর্তীতে এডিনবরা ইউনিভার্সিটির গিলক্রাইস্ট বৃক্ষি পরীক্ষা দেন তিনি এবং উত্তীর্ণ হন। তখন গিলক্রাইস্ট বৃক্ষির জন্যে তিনটি ভাষা জানা বাধ্যতামূলক ছিল। তিনি ইংরেজি ও সংস্কৃত ছাড়াও ল্যাটিন ও ফ্রেঞ্চ ভালই জানতেন। এটুকু অংশ থেকেই তার পড়াশোনার ব্যাপ্তি নিশ্চিত আন্দাজ করা যায়। এডিনবরা থেকে ১৮৮৪ সালে বিএসসি ডিগ্রি পান তিনি।

এখানেই 'ইন্ডিয়া বিকোর অ্যান্ড আফটার দ্য মিউটিনি' বিষয়ে এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় অংশ নেন ও চিহ্নিত হন বিপ্লবী ছাত্র হিসেবে। ভারতে ব্রিটিশদের গুপ্তনিবেশিক শাসনের কুপ্রভাব সাহসিকতার সঙ্গে তুলে ধরতে পেরেছিলেন তিনি তাঁর সেই লেখায়। তাঁর এই তীব্র দেশাত্মবোধ না না ভাবে প্রকাশ পেত তাঁর বিভিন্ন কাজে।

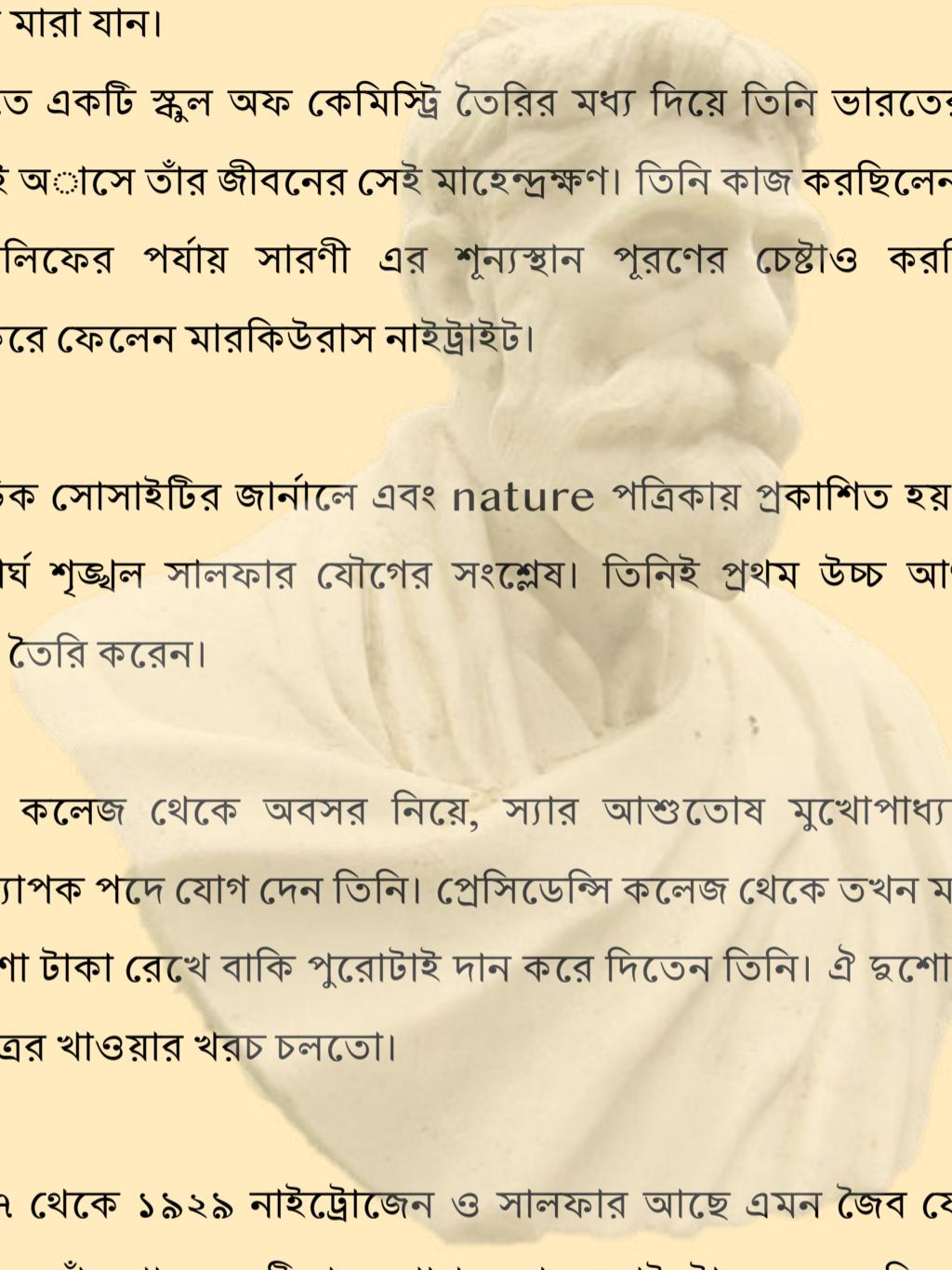
ডিএসসি ডিগ্রি এবং 'হোপ প্রাইজ' বৃক্ষি নিয়ে ১৮৮৮-তে তিনি অবশ্যে ফিরে এলেন কলকাতায়। ১৮৮৯ সালে প্রেসিডেন্সিতে শুরু হল তাঁর দীর্ঘ ২৭ বছরের শিক্ষক জীবন মাসিক মাত্র ২৫০ টাকা বেতনে। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নেটিভ হওয়ার কারণে অপেক্ষাকৃত কম মাইনে ও কম সম্মানের প্রতিলিয়াল অধ্যাপক হিসেবে।

১৮৯১ সালে অনিদ্রা রোগে আক্রান্ত হন তিনি। পুজোর ছুটিতে দেওঘর গমন করেন। দেশীয় গাছ পালা, ভেষজ উদ্বিদ নিয়ে গবেষণা করেন।

১৮৯৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে তাঁর দ্বিতীয় গবেষণাপত্রে বিষয় ছিল ঘি ও সর্বের তেলের ভেজাল নির্গয় করা এবং বিভিন্ন প্রসাধনী, ওষুধের কাঁচামাল প্রস্তুত করা।

এই বছরেই পিতা হরিশচন্দ্র মারা যান।

এরপর ১৮৯৫ সালে ভারতে একটি স্কুল অফ কেমিস্ট্রি তৈরির মধ্য দিয়ে তিনি ভারতের আধুনিক রসায়নের জনক রূপে চিহ্নিত হন। এরপরেই অংসে তাঁর জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। তিনি কাজ করছিলেন ভারতের কিছু বিরল খনিজ পদার্থ নিয়ে এবং মেঞ্জেলিফের পর্যায় সারণী এর শূন্যস্থান পূরণের চেষ্টাও করছিলেন। এই সময় খানিক অপ্রত্যাশিতভাবেই তৈরি করে ফেলেন মারকিউরাস নাইট্রাইট।



এটি ১৮৯৬ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে এবং *nature* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এছাড়াও তাঁর আর একটি মেলিক গবেষণা হলো দীর্ঘ শৃঙ্খল সালফার যৌগের সংশ্লেষ। তিনিই প্রথম উচ্চ আণবিক ভর (৩০৬৮) বিশিষ্ট *organosulphur* যৌগ তৈরি করেন।

১৯১৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর নিয়ে, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এর আমন্ত্রণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ পালিত অধ্যাপক পদে যোগ দেন তিনি। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তখন মাসিক পেনশন পেতেন ৪৩০ টাকা। এর মধ্যে থেকে ছশো টাকা রেখে বাকি পুরোটাই দান করে দিতেন তিনি। ঐ ছশো টাকায় তাঁর এবং তাঁর সাথে থাকা ৪-৫ জন গবেষক ছাত্রের খাওয়ার খরচ চলতো।

জীবনের শেষ দিকে ১৯২৭ থেকে ১৯২৯ নাইট্রোজেন ও সালফার আছে এমন জৈব যৌগ নিয়ে কাজ করতে শুরু করেন তিনি এবং এই বিষয়ে তাঁর প্রায় ৫০ টি গবেষণাপত্র আছে। নাইট্রোজেনের অক্সি অ্যাসিড ও তার নানা ধাতব যৌগ নিয়ে তাঁর গবেষণাপত্রের সংখ্যাও প্রায় ৫০। প্লাটিনাম গ্রুপের ধাতুদের আচার আচরণ নিয়েও প্রায় ২৫ টি গবেষণাপত্র আছে। ১৯৩৬ সালে ৭৫ বছর বয়েসে তাঁর শেষ গবেষণাপত্রটি থায়োক্যান্ফর বিষয়ে প্রকাশিত হয় *nature* পত্রিকায়।

১৯৩১ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলা সাহিত্য পরিষদের অধ্যক্ষ ছিলেন। বেশ কিছু সূত্র থেকে জানা যায়, তাঁর সুন্দর বাচনভঙ্গি ও রসবোধ দিয়ে বাংলা ভাষায় বক্তৃতার মাধ্যমে রসায়নের পাঠ ছাত্রদের কাছে সহজবোধ্য ও মনোগ্রাহী করে তুলতেন তিনি। বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের সফলতার জীবন কাহিনী গল্পের ছলে তুলে ধরতেন ছাত্রদের কাছে। অল্প সময়েই শিক্ষক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ,

পঞ্চানন নিয়োগী, পুলিন বিহারী সরকার, গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী, এ কে ফজলুল হক, রসিক লাল দত্ত সবাই তাঁরই ছাত্র ছিলেন।

তিনিই প্রথম বুঝেছিলেন, “একটা সমগ্র জাতি শুধুমাত্র কেরানী বা মসীজীবী” হয়ে টিকে থাকতে পারে না। তাই তৈরী করেছিলেন তাঁর স্বপ্নের বেঙ্গল কেমিকাল। এ ছাড়াও ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস, বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস, ন্যাশনাল

ট্যানারি ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠায় তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোগী। এডিনবরায় থাকাকালীন সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল সোসাইটির সদস্য রূপে বিভিন্ন রাসায়নিক কারখানা পরিদর্শন করে রাসায়নিক কারখানা তৈরির প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন বৃথা ঘায় নি তাঁর।

বিস্মৃতির অতল গহ্ন থেকে তিনিই খুঁজে বের করলেন রসায়ন শাস্ত্রে প্রাচীন ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। ধাতু সঞ্চর তৈরিতে ভারত যে পিছিয়ে ছিল না, চরক-সংহিতা-সুশৃঙ্খল সংহিতায় উল্লেখিত অন্ত্রোপচারের সূক্ষ্মাগ্র যন্ত্র যেমন স্ক্যালপোল বা ল্যানসেট তার প্রমাণ। ইস্পাত আবিঞ্চ্ছারের প্রথম কৃতিত্বও প্রাচীন ভারতের। প্রাচীন রসায়নে শুধু ইঞ্জিপ্ট, সিরিয়া, চিন বা আরব নয় প্রাচীন ভারতের প্রথম কৃতিত্বও যে কতটা এগিয়ে ছিল, তা তুলে ধরতেই তিনি লিখলেন ‘দ্য হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি’। এ বিষয়ে প্যারিসের বিখ্যাত বিজ্ঞানী মার্সিলিন বের্তেলোর সান্নিধ্য তাঁকে সত্যিই অনুপ্রাণিত করে। এই কাজের জন্য সংস্কৃত ও পালি ভাষাও শিখেছিলেন তিনি।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জন্য অন্ত্র কেনায় বিপ্লবীদের গোপনে অর্থসাহায্য করেছেন তিনি। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় ১৯টি দেশাত্মক গানের সংকলনও বের করেন, নাম ছিল "উদ্দীপনা"।

১৯০৬ সালে তিনিই গান্ধীজির প্রথম জনসভার আয়োজন করেন। ১৯১৯ সালে কলকাতার টাউন হলে রাওলাট বিলের প্রতিবাদে জনসভায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অনুরোধে তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, "দেশের জন্য প্রয়োজন হলে ছাত্রদের টেস্ট টিউব ছেড়ে গবেষণাগারে র বাইরে আসতে হবে, বিজ্ঞানের গবেষণা অপেক্ষা করতে পারে কিন্তু স্বরাজের জন্য সংগ্রাম অপেক্ষা করতে পারে না।"

প্রফুল্লচন্দ্র ১৩ টি ইংরেজি ও ২২টি বাংলা বইও রচনা করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুলেখক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের ভাষণ ছাড়াও না না বিষয়ে ৩০০ টিরও বেশি প্রবন্ধ রচনা করেন তিনি। তাঁর সেরা সৃষ্টি অবশ্যই A HISTORY OF HINDU CHEMISTRY। এটি থেকে জানা ঘায় প্রাচীন কালেও লবণ, মার্কারি সালফাইড, পাতন প্রক্রিয়া, স্টিল তৈরি সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা ছিল। বিজ্ঞান গবেষণা ও অগ্রগতির অধঃপতন এর মূল কারণ হিসেবে আচার্য মনুর বর্ণশ্রমবাদ এবং শঙ্করাচার্যের বেদান্তবাদ কে চিহ্নিত করেন তিনি। তিনি মনে করেন, যেদিন থেকে মাথার কাজ

বড় হয়ে উঠলো, হাতপায়ের কাজের কোনো দামই রইলো না, সেদিন থেকেই অধঃপতনের শুরু। ১৯০১ সালে চরক
ও সুশ্রূত এর সময় নিরূপণ এবং ১৯০৩ সালে আয়ুর্বেদের প্রাচীনত্ব বিষয়ক রচনাও লেখেন তিনি।

তাঁর বিশ্বাস ছিল "শিল্পায়নের মধ্য দিয়েই ভারতবাসীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি হবে।" ইংরেজ সরকারের বাধা ও
অসহযোগিতা কে উপেক্ষা করে একক প্রচেষ্টায় তাই ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠা করেন **BENGAL CHEMICAL &
PHARMACEUTICALS LIMITED.** সেই সময় এই প্রতিষ্ঠা প্রায় ১৮০০ শ্রমিকের কর্মসংস্থান করতে পেরেছিল।

এও তাঁর দেশপ্রেমেরই অন্যতম প্রকাশ। মূলধন ছিল মাত্র ৮০০ টাকা যা তার জীবদ্ধাতেই ৫০ লক্ষ টাকায় পরিণত
হয়।

কিন্তু এই প্রাণাধিক প্রিয় সন্তান সম বেঙ্গল কেমিক্যাল কেও শেষের দিকে ছেড়ে আসতে হয় তাঁকে না না মতানৈক্যের
কারণে। রাগে ছুঁথে অপমানে তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালের সভাপতি পদ থেকে সরে দাঁড়ান। পদত্যাগ পত্রের শেষে
তিনি লেখেন, "এই দেশ একদিন আমার খুব চেনা ছিল, আজ পুরোপুরি অচেনা।"

জীবনের শেষ ১ বছর খুব কষ্টে কেটেছিল তাঁর। দিনরাত্রির অধিকাংশ সময় শুয়েই থাকতে হত তাঁকে। ১৯৪৪ সালের
১৬ই জুন তাঁর জীবনের বহুল কর্মসূতায় চির বিশ্রাম নেমে আসে। শোকসন্ধি হয় সারা দেশ। তাঁর ছাত্র মেঘনাদ
সাহার ভাষায়, "ভারত বাস্তবিকই বৈজ্ঞানিক গবেষণার জনক কে হারালো।"

এহেন প্রফুল্লচন্দ্র কে আমরা সত্যিই কতটা মনে রেখেছি? আমাদের অভ্যন্তর জীবনের চক্রবৃহ্যে আত্মত্থ্বি কোথায়?
আত্মকেন্দ্রিক হতে হতে আমরা ক্রমশ আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ছি না তো? শিল্প স্বনির্ভর ভারত গড়ার লক্ষ্যে তাঁর
প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল আজ বিলগ্নিকরণের পথে, যদিও এখানকার বহু পণ্য যেমন
ফিনাইল, কালমেঘ, ক্যান্থারাইডিন অয়েল, ন্যাপথালিন, ইথুরিয়া অয়েনমেন্ট, অ্যাকুয়াটাইকোটিস সহ নানা ঔষুধ
আজও অত্যন্ত জনপ্রিয়। এই সংস্থাটির সঙ্গে জুড়ে রয়েছে জাতীয়তাবাদী বাঙালির গৌরবগাঁথা। আশা করি, আগামী
দিনে ঝণমুক্ত হয়ে মিনিরত্ন (মহারত্ন, নবরত্ন, মিনিরত্ন ১, মিনিরত্ন ২) ক্যাটাগরির তকমা আদায় করে নেবে আমাদের
প্রিয় বেঙ্গল কেমিক্যালস।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রদর্শিত পথই হোক আমাদের লক্ষ্য। তাঁর জীবনালোকে দূরীভূত হোক বাঙালীর এই
আত্মবিস্মৃতির আঁধার।

U



অচেনা প্রফুল্লচন্দ্ৰ

সুকল্যাণ চ্যাটার্জী

(সেম-৪, রসায়ন বিভাগ)

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্ৰ রায় কে আমরা এক বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মানুষ বলতে পারি। কখনো তাঁকে আমরা দেখেছি বিজ্ঞানী হিসাবে, কখনো সমাজ সংস্কারক রূপে, কখনো অকৃত্রিম দেশপ্ৰেমিক হিসাবে, কখনো আদৰ্শ শিক্ষকের প্রতি মূর্তি রূপে আবার কখনো বা প্ৰাবন্ধিক হিসাবে। বৈজ্ঞানিক প্রফুল্ল চন্দ্ৰ কে কমবেশি আমরা সকলেই চিনি। যদিও একেত্রে একটি কথা বলা বাঞ্ছনীয়, ইনৱেগানিক এবং অগানিক কেমিস্ট্ৰি-ৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰে তাঁৰ অনন্যসাধাৰণ অবদান সত্ত্বেও বৰ্তমান শিক্ষিত সমাজেৰ কাছে শুধুমাত্ৰ মারকিউৱাস নাইট্ৰাইট এৱং আবিষ্কাৰ টাই যদি তাঁৰ পৰিচয় হয়ে থাকে, তাহলে তাতে আমাদেৱ পড়াশোনাৰ সীমাবদ্ধতাই প্ৰকাশ পায়, তাঁৰ গৱিমা বিন্দুমাত্ৰ ফিকে হয় না, এটা বলাই বাহ্যিক। যাই হোক, বৈজ্ঞানিক প্রফুল্ল চন্দ্ৰেৰ চৱিত্ৰেৰ অন্য দিকগুলিৰ সঙ্গে পৰিচয় কৱানোই আমাৰ উদ্দেশ্য, এবং সেই জন্য তাঁৰ জীবনেৰ কিছু ঘটনা ও তাঁৰ ই বলে যাওয়া কিছু কথা উদাহৰণস্বৰূপ নেওয়া যেতে পাৱে।

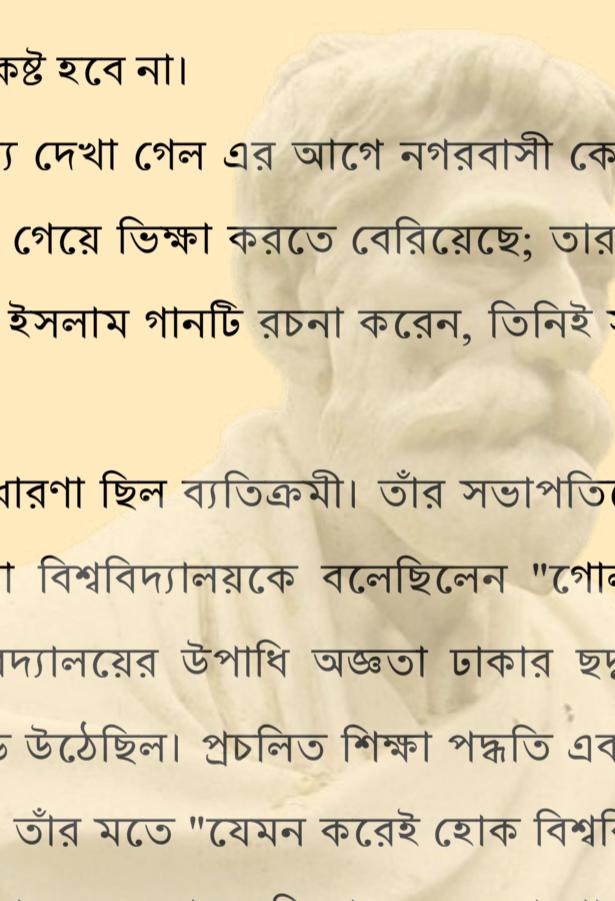
সালটা ১৯০৯, সুৱেন্দ্ৰনাথ ব্যানার্জিৰ দৈনিক "বেঙ্গলি" পত্ৰিকায় প্রফুল্লচন্দ্ৰেৰ "বাঙালিৰ মস্তিষ্ক ও তাৰ অপব্যবহাৰ" শীৰ্ষক প্ৰবন্ধ টি যখন ছেপে বেৱলো, বাঙালি শিক্ষিত যুবকদেৱ মনে যেন একটা ছোটখাটো বিস্ফোৱণ ঘটে যায়। বাঙালিৰ সামাজিক অধঃপতন ও দৈনন্দিন অৰ্থনৈতিক সমস্যা গুলো নিয়ে এমন গভীৰ অথচ সৱল চিন্তাভাবনা স্বভাবতই সকলেৰ মৰ্ম স্পৰ্শ কৰে। বাঙালিৰ অন্য সমস্যাও তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল। ১৯১৯ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি "অন্য সমস্যা ও তাৰ প্ৰতিকাৰ" বক্তৃতায় বলেছিলেন, "ল্যাবৱেটৱি ছেড়ে, টেষ্ট টিউব ফেলে দিয়ে আমি যে আজ আপনাদেৱ সামনে এসে দাঁড়িয়েছি এ শুধু পেটেৱ জ্বালায়। বাঙালিৰ জঠৱানল আজ প্ৰজন্মলিত হয়েছে, কিন্তু সেই আগুন নেভানোৱ মতো অন্য কোথায়? বাঙালিৰ সামনে আমি আজ একটাই সমস্যা দেখতে পাচ্ছি- জীবনধাৰণ সমস্যা। আজ থেকে এই সমস্যাৰ সমাধানে কাজ কৱা হবে আমাৰ জীবনেৰ ব্ৰত।"

এবাৰ আৱেকটি ঘটনাৰ কথায় আসা যাক, তিনি যখন চতুৰ্থবাৰ ইংল্যান্ড থেকে ফিৱলেন, সেই সময় অধুনা বাংলাদেশেৰ খুলনা জেলাৰ সুন্দৱন অঞ্চলে ভয়ঙ্কৰ রুভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। তাঁৰ আত্মচিৰিতে প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ লিখেছেন, কলকাতায় থাকাকালীন তিনি অবস্থাৰ গুৱৰত্ব বুৰাতে পাৱেননি, কিন্তু মে মাসেৱ ছুটিতে যখন গ্ৰামে এলেন তখনই রুভিক্ষেৰ আসল চেহাৱা দেখতে পেলেন। দেখলেন, শুধু না খেতে পেয়ে শয়ে শয়ে নৱ-নাৱী, শিশু মাৱা যাচ্ছে। অথচ খুলনাৰ ম্যাজিস্ট্ৰেট নিৰ্বিকাৰ। প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ তখন আৰ্থিক সেবায় এগিয়ে এলেন, অৰ্থ সাহায্যেৰ জন্য দেশবাসীৰ কাছে আবেদন জানালেন। তাঁৰ ডাকে দেশবাসী সৰ্বান্তকৰণে সাড়া দিল, বৱিশাল ও ফৱিদপুৱ জেলা থেকে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবী তাঁৰ সাহায্যে এগিয়ে এলেন।

এরপর চলে যাওয়া যাক ১৯২২ সালে। পুজোর সময়। তৎকালীন উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা হল। রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলায় বহু মানুষের ঘরবাড়ি, গ্রন্থ-বাচ্চুর, শস্য সব বন্যায় সব ভেসে যাওয়ার উপক্রম। আবার ছর্গত মানুষের সেবার জন্য আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রিলিফের ব্যবস্থা করলেন। সায়েন্স কলেজে তাঁরই ঘরে বসেছিল Bengal Relief Committee-র অফিস। সবাই সেদিন দেখেছিল ক্ষীণদেহী ঘাটোধৰ্ব একাকী মানুষ যেন একশ জন হয়ে কাজ করছেন। ১৯২২ সালের 22 শে সেপ্টেম্বর থেকে আবার শুরু হল প্রবল বৃষ্টি, আগ্রাই নদী দেখতে দেখতে ফুলে ফেঁপে উঠলো এবং কিছুদিনের মধ্যেই আবার বন্যা দেখা দিল। এইবার অবশ্য সংকট ত্রাণের কাজে প্রফুল্ল চন্দ্র পাশে পেলেন আর এক বাঙালী যুবককে। নাম তাঁর সুভাষচন্দ্র বসু! সেবার দুজনের মিলিত প্রয়াসেই বন্যা ত্রাণের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলেছিল। একদিন রিলিফ অফিসে গেছেন সুভাষচন্দ্র। বললেন, চাঁদার জন্য রাস্তায় নামলে কেমন হয়?

- খুব ভালো হয়। আমিও তোমাদের সঙ্গে থাকব।
- আপনি কি অত হাঁটতে পারবেন?
- খুব পারবো। সকালের দিকে বেরুলে কষ্ট হবে না।

পরেরদিন মহানগরীর রাজপথে যে দৃশ্য দেখা গেল এর আগে নগরবাসী কোনদিন তা দেখেনি। কলকাতার শিক্ষিত যুবকরা গলায় হারমোনিয়াম বেঁধে গান গেয়ে ভিক্ষা করতে বেরিয়েছে; তারা গাইছে "ভিক্ষা দাও, ওগো পুরুষাসী।" আচার্যদেবের অনুরোধে কাজী নজরুল ইসলাম গানটি রচনা করেন, তিনিই সুর দেন। আর এই মিছিলের পুরোভাগে রয়েছেন প্রফুল্লচন্দ্র এবং সুভাষচন্দ্র!



প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কেও তাঁর ধারণা ছিল ব্যতিক্রমী। তাঁর সভাপতিত্বে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ উন্নতির শিখর স্পর্শ করেছিল। প্রফুল্লচন্দ্র-ই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বলেছিলেন "গোলামখানা" আর স্নাতকদের বলেছিলেন "মার্কাধারী মুর্খ"। বলেছিলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অঙ্গতা ঢাকার ছদ্মবেশ মাত্র।" তাঁর সেদিনকার মন্তব্যে তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে বিতর্কে ঝড় উঠেছিল। প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি এবং জীবন সংগ্রামে তার দাম কি? এই মূল প্রশ্নটিই সেদিন তিনি তুলে ধরেছিলেন। তাঁর মতে "যেমন করেই হোক বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা না মিললে জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে- এই ধারণা অত্যন্ত ভুল। আমাদের দেশের অভিভাবক দের ধারণা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উন্নীর্ণ হতে না পারলে ভাবী জীবনঘাতার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। আমি কিন্তু তা মনে করি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ঝৰ্ণী নন এমন অনেককে আমি জানি যাঁরা আত্মচেষ্টা ও পুরুষকার বলে জীবন-সংগ্রামে শীর্ষ স্থান অধিকার করেছেন।" আজ প্রায় একশ বছর পরেও তাঁর চিন্তাধারা কতটা প্রাসঙ্গিক তা বোঝার জন্য শিক্ষাবিদ হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

এবার সময়ের সরণি ধরে যদি আমরা বেশ খানিকটা পিছনে ফিরে যাই, তাহলে আরও একটি ঘটনা আমাদের চোখে পড়বে। ইংল্যান্ডের উত্তরদিকে স্কটল্যান্ড। তার রাজধানী এডিনবর। এই এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তখন একটি বৃত্তি পরীক্ষার আয়োজন করা হতো। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্র ছাত্রীরা এই পরীক্ষাটি তে অংশগ্রহণ করতেন। স্কলারশিপটির নাম ছিল "গ্রিলক্রিস্ট স্কলারশিপ।" সালটা ১৮৮২। স্টেটসম্যান পত্রিকায় ফল বেরুল, জানা গেল ভারতবর্ষ থেকে মাত্র দুজন নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র একজন। এই পর্যন্ত আমরা সবাই জানি।

এইবার আসল ঘটনায় আসি, এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএসসি পড়াকালীন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন; বিষয় ছিল, "সিপাহী বিদ্রোহের আগে আর পরে ভারতের অবস্থা।" পরাধীন ভারতের যুবক প্রফুল্লচন্দ্র ইহাতে এই সুযোগ লুকে নিলেন। তাঁর প্রবন্ধে যেভাবে স্পষ্ট ভাষায় অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকারের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দিয়েছিলেন, তা দেখে অনেকেই তাঁর সৎ সাহসের প্রশংসা করেন। ইংল্যান্ডে থেকে কেউ যে এইভাবে ব্রিটিশ সরকারের খোলাখুলি সমালোচনা করতে পারে, কেউ তা ভাবতেও পারত না। তিনি লিখেছিলেন "ভারতবর্ষের প্রতি কর্তব্য পালনে ইংল্যান্ড এখনো পর্যন্ত ব্যর্থ এবং শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ।" তিনি আরো বলেন "আজ তোমরা নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাবে, কাল চীনের সঙ্গে, এই তোমাদের যুদ্ধ মিশরের সঙ্গে, ওই আফগানের সঙ্গে। আর তোমাদের সেই পাপের, মুর্খতার, ভ্রান্তির বোৰা বইতে হবে আমার দুখিনী ভারতবর্ষকে। এ অন্যায়, এ ঘোর অন্যায়।" বলা বাহ্যিক তাঁর এই প্রবন্ধটি কোন পুরস্কার পায়নি।

প্রফুল্ল চন্দ্রের জীবনের এরকম অসংখ্য ঘটনার কথা জানা যায় এবং প্রত্যেকটি ঘটনায় তাঁর মনীষার ছাপ সুস্পষ্ট। তাঁর এই ১৫৯ তম জন্মবার্ষিকীতে বিজ্ঞান, যুব সমাজ এবং সর্বোপরি আমাদের এই দেশ ভারতবর্ষের মানুষের প্রতি তাঁর অপরিসীম অবদানের জন্য আমরা তাঁর কাছে চিরখৰণী। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানানোর উপযুক্ত ভাষা আমার জানা নেই। তাই কবিগুরুর কথা ধার করে বলতে পারি "বাস্তবের জগতে প্রচলন শক্তিকে উদ্ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তারচেয়ে গভীরে প্রবেশ উকরেছেন, কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন তার গুহাস্থিত, অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোধশক্তিই। নিজেকে অক্ষণভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে এ কখনো সন্তুষ্পূর্ণ হত না।"



অধ্যাপক প্রফুল্ল চন্দ্র

কৌশিক ভগৃ

(সেম-2, রসায়ন বিভাগ)

৩

১৮৮৯ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রেসিডেন্সী কলেজের সহ-অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। তৎকালীন প্রেসিডেন্সী কলেজের একতলার এক পুরনো ঘরে তখন ছিল রসায়ন বিভাগ। কিন্তু সেই সময় বি. এস সি. ও এম. এস সি. পরীক্ষায় রসায়ন শাস্ত্রে ছাত্রের সংখ্যা প্রতিবছর বৃদ্ধি ঘটছিলো এবং সেই হিসেবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল ব্যবহারিক ক্লাসের সংখ্যা। ল্যাবরেটরিতে অনিষ্টকর গ্যাস বেরোনোর কোনো ব্যবস্থা ছিল না, বায়ু চলাচলেরও কোনো ব্যবস্থা ছিলনা। বিশেষত বর্ষাকালে ধূম ও গ্যাস আচ্ছন্ন হয়ে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর পরিবেশ তৈরি হয়ে যেত। এমনই এক সময়ে

একদিন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তৎকালীন প্রিস্নিপ্যাল টনী সাহেব-কে ল্যাবরেটরিতে ডাকলেন এবং চারদিকে ঘুরে গৃহের বায়ুতে কয়েক মিনিট নিঃশ্বাস নিতে বলেন। প্রিস্নিপ্যাল টনী সাহেবের ফুসফুস স্বভাবতই একটু ছর্বল ছিল। তিনি ছ-তিন মিনিট সেখানে থাকার পর উভেজিত হয়ে বাইরে চলে গেলেন এবং শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরকে এ বিষয়ে এক চিঠি লিখলেন। ডিরেক্টর সাহেবও বুঝতে পারলেন যে, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সহ একটি নতুন ল্যাবরেটরি তৈরি করা অত্যন্ত প্রয়োজন। ডিরেক্টর সাহেব তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষাবিদ ক্রফট সাহেবকে সব কথা বুঝিয়ে কলেজে ডাকলেন এবং বাংলার গর্ভমেন্টের কাছেও নতুন ল্যাবরেটরির জন্য চিঠি দিলেন। খুব শীঘ্ৰই গর্ভমেন্ট নতুন ল্যাবরেটরি তৈরির প্ল্যান মণ্ডুর করে। এডিনবৱা বিশ্ববিদ্যালয়ের (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যেখান থেকে বি. এস. সি ও ডি. এস. সি ডিগ্রি লাভ করেন) নতুন গবেষণাগারের এক বর্ণনাপত্র আচার্যের কাছে ছিল, তাছাড়াও জার্মানির কয়েকটি ল্যাবরেটরির সাহায্যে প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়নের নতুন ল্যাবরেটরি স্থাপিত হয়। ১৮৯৪ সালে নতুন ল্যাবরেটরি গড়ে ওঠে এবং শীঘ্ৰই ভাৱতেৰ বিভিন্ন স্থান থেকে এই নতুন বিজ্ঞানাগার দেখবার জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আসতে থাকেন এবং এই সময় থেকেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রাসায়নিক গবেষণা কার্যে নতুন উৎসাহ পান। তিনি কতকগুলো দূর্ভৱ ভাৱতীয় ধাতু বিশ্লেষণ করেছিলেন, এই আশা নিয়ে যে ছ-একটি নতুন পদাৰ্থ আবিষ্কার কৰা যাবে।

টমাস হল্যান্ড "জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া" বিভাগের একজন সহকারী এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে ভূতত্ত্বে লেকচারার ছিলেন। তিনি অনুগ্রহপূর্বক কতকগুলি ধাতুৰ নমুনা আচার্যকে দেন এবং তিনি এবিষয়ে নতুন গবেষণা শুরু করেন। "Crooks' Select Methods in Chemical Analysis" ছিল সেসময়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ এবং তারই অনুসরণ কৰে তিনি গবেষণা কৰতে থাকেন। তিনি এই গবেষণাকাৰ্যে কিছু অগ্রসৱ হয়েছেন এমন সময়ই তার রসায়নচৰ্চাৰ জীবনে এক অপ্রত্যাশিত পৱিত্ৰণ ঘটে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্ৰের মতে মারকিউরাস নাইট্রাইট আবিষ্কার তাঁৰ জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটায়। এ বিষয়ে প্রকাশিত প্ৰথম বিবৃতিৰ পত্ৰিকায় তিনি লিখেছিলেন- "সম্পৃতি পারদেৱ উপৰ অ্যাসিডেৱ ক্ৰিয়া দ্বাৰা মারকিউরাস নাইট্রাইট প্ৰস্তুত কৰিতে গিয়া, আমি নীচে একপ্ৰকাৰ পীতবৰ্ণেৱ দানা পড়িতে দেখিয়া কিৱৎ পৰিমাণে বিস্থিত হইলাম। প্ৰথম দৃষ্টিতে ইহা কোনো 'বেসিক সল্ট' বলিয়া মনে হইল। কিন্তু একুশ প্ৰক্ৰিয়া দ্বাৰা ঐ শ্ৰেণিৰ কোনো 'সল্টেৱ' উৎপত্তি সাধাৱণ অভিজ্ঞতাৰ বিপৰীত। যাহা হউক প্ৰাথমিক পৰীক্ষার দ্বাৰা ইহা মারকিউরাস সল্ট এবং নাইট্রাইট উভয়ই প্ৰমাণিত হইল। সুতৰাং এই নৃতন মিশ্ৰ পদাৰ্থ গবেষণাৰ যোগ্য মনে হইতেছে।"

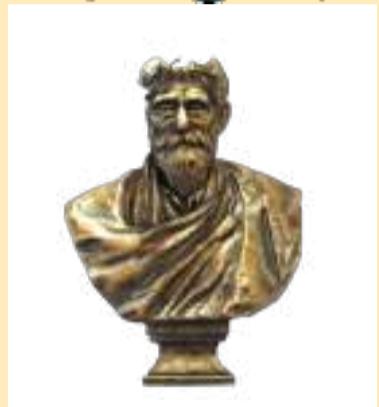
মারকিউরাস নাইট্রাইট ও তার আনুষঙ্গিক বহুসংখ্যক পদাৰ্থ এবং সাধাৱণভাৱে মারকিউরাস নাইট্রাইট সম্পর্কিত গবেষণাৰ বিবৰণ রসায়নশাস্ত্ৰ সম্বন্ধীয় সাময়িক পত্ৰসমূহে প্ৰকাশিত হয়। তাঁৰ দ্বাৰা একটিৰ পৰ একটি নতুন মিশ্ৰ পদাৰ্থ আবিষ্কার হতে থাকে, আৱ তিনি অসীম উৎসাহে সেগুলি নিয়ে পৰীক্ষা কৰতে থাকেন। রঞ্জো, ডাইভার্স, বাৰ্থেলো, ভিক্টো মেয়েৱ, ফলহার্ড, এবং অন্যান্য বিখ্যাত রাসায়নিকদেৱ নিকট হতে প্ৰাপ্ত সমৰ্থনা তাঁৰ মনে উৎসাহেৰ সাথে-

সাথে কর্মক্ষেত্রেও অধিকতর প্রেরণা দান করেছিল। তাঁর মতে- "গবেষণা হইতে যে আনন্দ হয়, তাহার তুলনা নাই, ইহা হৃদয়কে উৎফুল্ল করে।"

Source-

1. "আত্মচরিত"- প্রথম খণ্ড (লেখক- আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়)
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Prafulla_Chandra_Ray

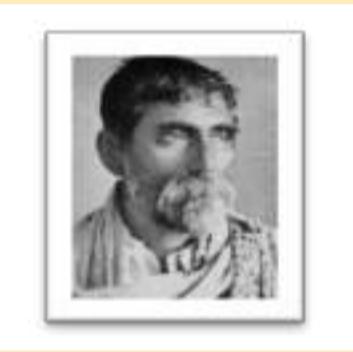
বিজ্ঞান ও সাহিত্য সাধনায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় চয়নিকা রায় (সেম-4, রসায়ন বিভাগ)



প্রাধীনতার শৃঙ্খলাবন্ধ ভারতের গৌরবসূর্য যখন প্রায় অস্তমিত, সেইসময় কলকাতার আকাশে যেন নবসূর্যেদয়ের ইঙ্গিত বহন করে এনেছিলেন স্বনামধন্য বাঙালি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বিশ্বসভায় ভারতবর্ষের গৌরবগাঁথা শোনালেন যিনি, সেই বিজ্ঞানসাধক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আজ বিস্মৃত প্রায়। বিজ্ঞান সাধনা ও রসায়নের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। ১৮৯৪ সালে তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রেসিডেন্সি কলেজে স্থাপিত হয় রসায়নের নতুন পরীক্ষাগার। প্রেসিডেন্সি কলেজে একদা অবসর গ্রহণ করার সময় তাঁকে শুন্দা জানিয়ে বলা হয়, "আধুনিক ভারতের ইতিহাস যেদিন লেখা হবে, সেদিন ভারতের রসায়নের প্রবর্তক হিসাবে আপনার নাম উচ্চারিত হবে। এদেশের রসায়ন শিক্ষার প্রসারে পথিকৃতের ভূমিকা পালনে এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলায় গৌরব-কৃতিত্ব আপনারই"। এই ল্যাবরেটরিতে বসে মারকিউরাস নাইট্রাইট, অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট ও হাইপোক্লোরাইট আবিষ্কার তাঁকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দিয়েছিল। একদা যিনি নিজেই বলেছিলেন, "I became a chemist by mistake", সেই মহান রসায়নবিদ রসায়ন জগতে তাঁর আবিষ্কারের জন্য অমর হয়ে থাকবেন।

শুধুমাত্র বিজ্ঞানসাধক হিসাবে নয়, সাহিত্যিক হিসাবেও তাঁর অবদান অতুলনীয়। তাঁর রচিত আত্মচরিত 'Life and experiences of a Bengali Chemist' (১৯৩২) এবং ইংরেজি বাংলায় রচিত বহু ধরনের প্রবন্ধাবলী তাঁর সাহিত্য সাধনার পরিচয় বহন করে। তাঁর 'আত্মচরিত' ইংরেজিতে রচিত হলেও বিপুল জনপ্রিয়তার জন্য পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করতে হয়। গ্রন্থের মুখ্যবন্ধে প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছেন, "শুধু নিজের জীবনী নয়, প্রায় অর্ধশতাব্দী ব্যাপী অভিজ্ঞতামূলক সমসাময়িক অর্থনীতি, শিক্ষাপদ্ধতি ও তাহার সংস্কার, সমাজসংস্কার প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক সমালোচনা এই পুস্তকের বিষয়বস্তু"। আত্মচরিত' এক অর্থে বাঙালির জীবন দর্পণ। এছাড়া বাংলায় রচিত

"বাঙালির মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার", এবং "অন্নসমস্যায় বাঙালির পরাজয় ও তাহার প্রতিকার" তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ইই খন্দে প্রকাশিত -"History of Hindu Chemistry", 'Nature', 'Knowledge', 'American Chemical Society' এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে। চরক, সুশ্রুত, ভগভট্ট, বৃন্দ, চক্রপাণি কিংবা নাগার্জুন যে দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে গেছেন, সেইসব অজানা দিকগুলিকে তিনি "History of Hindu Chemistry"- র ইথন্ডে প্রকাশ করেছেন - যা তাঁর রচিত দীর্ঘ গবেষণাসমূহ রচনা। এইভাবেই বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক হিসাবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও তাঁর অবদান আমাদের সবার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।



মানবকল্যাণে অগ্রদূত

অভিযোক বল্লভ

(সেম-৪, রসায়ন বিভাগ)

৭

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ সময়টা ক্যালেন্ডারে সাধারণভাবে প্রতিভাত। কিন্তু অনুসন্ধান করে দেখা যায় অধিকাংশই জ্ঞানীগুণী মনীষীই কিন্তু বাংলায় এই খ্রিস্টাব্দেই জন্মেছেন। যাঁরা বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পের পাশাপাশি স্বদেশ প্রেমেও উদ্বৃক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। সেইরকমই এক মহৎ প্রতিভাবান মনীষী, যিনি বাঙালীদের কাছে বিজ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু ব্রিটিশ গোর্যেন্দাদের কাছে বিপ্লবী, যিনি বলে ওঠেন; "দেশের জন্য প্রয়োজন হলে বিজ্ঞানীকে টেস্টটিউব ছেড়ে গবেষণাগারের বাইরে আসতে হবে, বিজ্ঞানের গবেষণা অপেক্ষা করতে পারে কিন্তু স্বরাজের জন্য সংগ্রাম অপেক্ষা করতে পারে না", তিনি আর কেউ নন, রসায়নের রাজা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ ২ৱা আগস্ট বাংলাদেশের খুলনা জেলার(প্রাক্তন যশোহর জেলা) কপোতাক্ষ নদের তীর ঘেঁষা রাড়ুলিতে এই বঙ্গসন্তানের জন্ম হয়। তিনি পিতা হরিশচন্দ্র ও মাতা ভুবনমোহিনী দেবীর সন্তান ছিলেন। কৃষ্ণিবান, উদারমনা, সাহিত্যরসিক পিতার এবং দয়ালু, প্রগতিশীল মাতার সমস্ত গুণ পেয়েছিলেন তিনি।

কথিত আছে শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। এই শিক্ষার প্রসারে প্রফুল্লচন্দ্র মাতৃভাষাকে শিক্ষার প্রধান বাহন করতে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে মাতৃভাষা প্রচলনে তিনি আন্তরিকভাবে কাজ করেছেন এবং রসায়নবিদ্যার পরিভাষায় তিনি বাংলায় গ্রন্থ ও রচনা করেছিলেন।

এছাড়াও শিক্ষাগুরু হিসেবে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ক্লাসে ছাত্ররা মগ্ন হয়ে থাকতেন। ছাত্রদের গবেষণায় উৎসাহিত করতেন তিনি। তাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল বন্ধু ও পিতার। তাঁর বেতনের

বেশির ভাগই দরিদ্র ছাত্রদের জন্য ব্যয় করতেন। তাঁর ছাত্রদের নিয়েই তিনি দেশের আনাচে-কানাচে বন্যা, ঝড় ও মড়কে বিধ্বস্ত, বিপন্ন মানুষের সেবায় ছুটে যেতেন। তিনি বলতেন, “আমার ছাত্ররা সর্বদাই আমার প্রিয় বন্ধু ও সঙ্গী। আমি তাদের সুখ ও ছৎখের ভার নিই এবং তাদেরই একজন মনে করি। তারাও আজকের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবনা প্রসঙ্গে আমার মতামতের অংশীদার হয়”।

ব্রিটিশ শিক্ষা, পণ্য প্রভৃতি বর্জন করে দেশীয় শিল্পোদ্যোগ বিকাশের চেষ্টা স্বদেশী যুগে শুরু করেছিলেন তিনি। ব্রিটিশ শিল্প-বাণিজ্যের বাইরে দেশীয় রসায়ন শিল্পকে দাঁড় করানো এবং অখণ্ড বাংলায় তথা ভারতবর্ষে বিভিন্ন শিল্পের উন্নতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের তাগিদ আচার্যদেবের মাথায় চেপে বসে এবং সেই তাগিদই তাঁকে বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠা করতে উৎসাহ জুগিয়েছিল। ১৮৯২ সালে বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯০১ সালে বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিটিক্যালস ওয়ার্কস লিমিটেড নামে স্থাপিত হয়। এটাই ছিল ভারতবর্ষের প্রথম রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধ প্রস্তরের কারখানা।

বিজ্ঞানীর পাশাপাশি সমাজসংক্রান্তির ক্ষেত্রেও তাঁর মুখ্য ভূমিকা ছিল। বাল্যবিবাহ, জাতিভেদ প্রভৃতি হিন্দু সমাজের বহু কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ছিলেন। কিন্তু শুধু এইটুকুতে থেমে থাকেননি, তাঁর তীব্র দেশপ্রেম তাঁকে ইউরোপ থেকে দেশে ফিরিয়ে এনেছিল। ব্রিটিশ গোয়েন্দা দণ্ডে স্যার পি সি রায়ের নাম লেখা ছিল ‘বিজ্ঞানী বেশে বিপ্লবী’। তিনি স্বদেশ আন্দোলনের প্রথম পর্যায় থেকেই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯০৫ এ বঙ্গভঙ্গের ঘোষণাকে কেন্দ্র করে যখন বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন সক্রিয় হয়ে ওঠে, তখন গোপনে অন্ত্র ক্রয়ের জন্য তিনি বিপ্লবীদের অর্থ সাহায্য করতেন। ১৯১৬ সালে কলকাতায় তিনিই প্রথমবারের জন্য মহাত্মা গান্ধীর জনসভার আয়োজন করেছিলেন। ১৯১৯ সালে কলকাতার টাউন হলে রাউলাট বিলের বিরোধিতা করেছিলেন।

গান্ধীজির অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপনে উদ্বৃদ্ধ হয়ে তিনি নিজেকে কংগ্রেসের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত করেছিলেন। ১৯২৫ সালের জুনে অসহযোগ আন্দোলন প্রচারে গান্ধীজি খুলনায় আসলে সাতক্ষীরা জেলার তালার সৈয়দ জালাল উদ্দীন হাসেমী ও ডুমুরিয়ার মাওলানা আহমদ আলীকে সঙ্গে নিয়ে পি সি রায় স্টিমার ঘাটে তাকে স্বাগত জানান। পি সি রায় ছিলেন সম্বর্ধনা কমিটির সভাপতি। ১৯২৫ সালে কোকনাদ কংগ্রেসের কনফারেন্সে সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ আলীর অনুপস্থিতে কিছু সময় স্যার পি সি রায় সভাপতিত্ব করেন। একই সময় পাইকগাছা উপজেলার কাটিপাড়ায় ‘ভারত সেবাশ্রম’ নামে একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে নিজ জন্মভূমির এলাকার মানুষকে চরকায় সুতো কাটার মাধ্যমে স্বদেশী আন্দোলনে উদ্বৃদ্ধ করেন। বিজ্ঞান কলেজের বারান্দায় একটা চরকা স্থাপন করে তিনি নিজেও সুতো কাটতেন।

১৯৩০ সালে কংগ্রেসের লবন আইন অমান্য আন্দোলনের খুলনা জেলার স্থান হিসেবে পি সি রায় নিজ গ্রাম রাতুলিকে নির্বাচন করেন। সেইসময় বিজ্ঞানী পি সি রায়কে নিয়ে তাঁর নিজ গ্রাম ও আশপাশের গ্রামগুলোতে মানুষের মুখে মুখে নানা গল্প প্রচলিত ছিল যে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কেনার জন্য অর্থাৎ ব্রিটিশদের হয়ে কাজ করার জন্য প্রস্তাব

দিয়েছিলেন। তবে তিনি তো ছিলেন দেশপ্রেমিক, তাই সেটা মেনে নিতে পারেননি। এসব শুনে তিনি রসিকতার সাথে বলেছিলেন, "আমাকে কিনতে হলে তো আমার মাথা কেটে নিয়ে যেতে হবে। তাহলে আমার মাথা কেটে নিয়ে ঘান"। বর্তমান সময়ে দেশজুড়ে যে মারণাত্মক করোনা ভাইরাস, যার এখনও কোনো ভ্যাকসিন তৈরি না হওয়ায়, চিকিৎসায় হাইড্রক্সিলোরকুইন নামক ওষুধ ব্যবহৃত হচ্ছে। সৌভাগ্যবশত করোনা চিকিৎসায় হাইড্রক্সিলোরকুইন তৈরির ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন কারখানাটি আছে বলেই তা চেয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এই বিপদের সময় বেঙ্গল কেমিক্যালসই ভরসা। প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের বেঙ্গল কেমিক্যালসই পারে এখন পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের প্রাণ বাঁচাতে। তাঁর এই অবদানের কাছে আমাদের চিরকৃতজ্ঞতা।

৩

প্রফুল্ল চন্দ্র ও প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চা

সুমিত জানা

(সেম-4, রসায়ন বিভাগ)



আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "উপনিষদে কথিত আছে, যিনি এক তিনি বললেন, আমি বল হবো। সৃষ্টির মূলে এই আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এর সৃষ্টি ও সেই ইচ্ছার নিয়মে"। আচার্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি যথার্থ। পরাধীন ভারতে যেখানে বাঙালি তথা ভারতবাসীর মেধাকে ইংরেজরা নিজেদের থেকে নিম্নমানের বলে মনে করতো, সেই সময়েই প্রফুল্লচন্দ্র রায় নিজের মেধা ও গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন, ভারতবাসী ও পিছিয়ে থাকার নয়। আজীবন তিনি দেশের মানুষের কল্যাণে ছিলেন নিয়োজিত, তাই তাঁর জীবনের মূল্যায়ন করতে গেলে শুধু তাঁর গবেষণা নয়, দেশের ও জাতির প্রতি তাঁর যে ত্যাগ, সে কথা স্মরণ করে, তার দ্বারা উদুক্ষ হওয়াই হবে আমাদের প্রধান কাজ।

প্রাচীন যুগে আমাদের দেশে আয়ুর্বেদিক ঔষধ তৈরিতে পাতার নির্যাস সংগ্রহের জন্য নানা ধরনের ও আকারের বক্যন্ত্র ব্যবহার করা হত। ইউরোপের আলেমবিক বা আরবের আল-আণবিক আর ভারতীয় বক্যন্ত্র আসলে অভিন্ন। এর উৎপত্তিস্থল ভারত না হলেও ভারতীয়রা এর ব্যবহারে মোটেই পিছিয়ে ছিল না। রসায়নে আরেকটি বিষয়ে ভারতীয়রা ছিল পৃথিবীর পথ প্রদর্শক। নাইট্রাইট যৌগ নিয়ে গবেষণায় যিনি জগতকে দিশা দেখিয়েছেন সেই 'মাস্টার অফ নাইট্রাইটস' প্রফুল্ল চন্দ্র দেখালেন, পারদ বা মার্কারি প্রসেসিংয়ে ভারতে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। মকরধ্বজ ঔষধের একটি উপাদান হল পারদ। তিনি দেখালেন কীভাবে এই ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হত বক্যন্ত্র, মাটির হাঁড়ির মাঝে কীভাবে তাপ নিয়ন্ত্রণ করা হত। পারদ প্রক্রিয়াকরণের এত উন্নত পদ্ধতি সমকালীন পৃথিবীতে অজানা ছিল। তবু দুঃখের বিষয়, ভারতে রসায়নের এই উন্নতিগুলি না ছিল ধারাবাহিক না ছিল দ্রুত। বলা চলে প্রায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে

রসায়নের উন্নতি হচ্ছিল। নতুন জ্ঞান অর্জনের পর কিংবা একটি আবিষ্কারের পর বিজ্ঞান সাধারণত একটি ভরণ নিরে কিছুকাল এগিয়ে চলে। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে বিজ্ঞান চর্চার গতি ছিল শ্লথ, যা একসময় প্রায় স্তব্ধ হয়ে পড়ে। সে কারণেই দেখা যায় তেরোশো থেকে চোদশো সালের মধ্যে এই উন্নতি হলেও তারপর তা থেমে যায়। অন্যদিকে রেনেসাঁস পরবর্তী সময়ে ইউরোপ তখন হয়ে উঠেছিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পীঠস্থান। নিয়ন্ত্রণ তাত্ত্বিক ও পরীক্ষামূলক আবিষ্কারে পৃথিবীকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছিলেন সেখানকার বিজ্ঞানীরা। আর তখন ভারতীয় বিজ্ঞান চর্চা ছিল প্রায় বন্ধ্য। প্রাচীন ভারতের রসায়ন, এনাটমির উন্নতি, শল্য চিকিৎসার উন্নতি সব একসময় হারিয়ে গেল কেন?

সভ্যতা বিকাশ-লাভের স্বাভাবিক নিয়মেই তো তার রেশ বর্তমান থাকা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা হয়নি। এই বিলুপ্তির ছুটি কারণ প্রফুল্ল চন্দ্র দেখিয়েছেন। বৌদ্ধ যুগের ঠিক পরে যখন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আবার নতুন করে উত্থান ঘটে তাতে বর্ণশ্রম এবং জাতিভেদ প্রথা প্রবল আকার ধারণ করে। ফলে “মস্তিষ্কের সঙ্গে হাতের একটি বিচ্ছেদ ঘটে যায়”। অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা বিদ্যাচর্চা করতেন, কোনো কায়িক পরিশ্রম করতেন না। অন্য দিকে শারীরিক পরিশ্রম করতেন শূদ্ররা অথচ তাদের লেখাপড়া করা ছিল নিষিদ্ধ। ফলে তাত্ত্বিক চর্চা এবং বাস্তবের প্রেক্ষিতে পরীক্ষানিরীক্ষা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। এভাবেই বিজ্ঞানের পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ-সিদ্ধান্ত ধারাটি ভারতে প্রায় নির্মূল হয়ে যায়। ব্রাহ্মণরা অবরোহী যুক্তি বা ডিডাক্টিভ লজিকের সাহায্যে বিভিন্ন তত্ত্ব দিলেও পরীক্ষার কষ্টিপাথের তা যাচাই করার প্রয়োজন মনে করতেন না। তার মধ্যে উচ্চ মার্গের তত্ত্ব থাকলেও পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের আওতায় তারা আসেনি। রসায়নবিদ হিসেবে নিজের হাতে রাসায়নিক নিয়ে কাজ যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা প্রফুল্ল চন্দ্র অভিজ্ঞতা থেকে জানতেন। তাই তিনি দেখান, বৌদ্ধ যুগের বর্ণশ্রম-জাতিভেদ প্রথার শিথিলতা ভারতে বিজ্ঞান চর্চার উন্নতির যে বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল তা ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে কি ভাবে ক্রমে ধ্বংস হয়ে যায়। দ্বিতীয় যে কারণটি বিজ্ঞান চর্চার অন্তরায় হয়েছিল সেটি দার্শনিক। প্রফুল্ল চন্দ্র দেখালেন বেদান্তবাদী শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ ছিল বিজ্ঞানের পক্ষে মস্ত ক্ষতিকারক। তিনি স্বীকার করেছেন শঙ্করাচার্যের মতো প্রতিভাবান লজিশিয়ান ভারতে খুবই কম জন্মেছেন। কিন্তু সে-প্রতিভা তিনি ব্যয় করেছেন ভুল দিকে। তাঁর প্রচারিত মায়াবাদ শেখায় যে, আমাদের চারপাশের সব বস্তু, তার উপাদান সবই আসলে মিথ্যা। যে দৃশ্যমান জগতের মাঝে আমাদের অস্তিত্ব সেই বিশ্ব প্রকৃত পক্ষে অস্তিত্বহীন।

এই কারণে তিনি প্রবল আক্রমণ করেছিলেন প্রাচীন ভারতের বৈশেষিক দর্শনের পরমাণুবাদকে। খৃষি কণাদের অসামান্য অবদান ছিল পরমাণুবাদ। সমস্ত পদার্থ আসলে খুব সূক্ষ্ম কিছু অতি ক্ষুদ্র কণা দিয়ে তৈরি, এহেন আধুনিক মতবাদটির বিকাশ লাভ করার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়েছিল শঙ্করাচার্যের প্রভাবশালী বিরোধিতা। এছাড়াও ন্যায়, বৈশেষিক দর্শনে পদার্থের শ্রেণীবিভাগের চেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত বৈশেষিকে যেভাবে এ বিশ্ব চরাচরের সমস্ত মৌল বস্তুকে সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল তারও তুমুল সমালোচনা করেছেন শঙ্করাচার্য। আজকের প্রেক্ষিতে সেই বিভাগ ভ্রান্তিবহুল মনে হলেও মৌলের শ্রেণীবিভাগ করার প্রয়োজনীয়তা ভারতীয়রা সে যুগে উপলব্ধি করেছিলেন, এও কম আশচর্যের কথা নয়। প্রফুল্ল চন্দ্র শঙ্করাচার্যের রচনার শ্লোক তুলে দেখিয়েছিলেন এই ধরণের সমালোচনায় তিনি কোনও রকম যুক্তির সাহায্য নেননি, কেবল মনু সহ নানা প্রাচীনতর খৃষিরা যেহেতু একে মন্দ বলেছেন, তাই এর বিরোধিতা করা কর্তব্য হিসেবে মেনেছেন। যুক্তিগ্রাহ্য মত অস্বীকারের ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় কর্তৃত্বের দোহাই দেবার মতো ভ্রান্ত একটি পথ তিনি অবলম্বন করেছিলেন আর অপর পক্ষে তাঁর মায়াবাদ প্রচার করেছিল বাস্তব বিমুখতা। মায়াবাদ

অনুসারে বক্ত সৃষ্টি এই জগতের অস্তিত্বই যদি না থাকে, তবে সেই বক্তর গঠন বিশ্লেষণ কিংবা তা নিয়ে গবেষণায় কেন উৎসাহী হবে মানুষ? ফলে মায়াবাদে প্রচারিত জগত সম্পর্কে এই নেতৃত্বাচক ভাবনা নষ্ট করে দেয় বিজ্ঞান চিন্তার পরিমণ্ডল।

ভারতের বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে পরীক্ষানিরীক্ষার অভাব অনুভব করেছেন সাহিত্যিক বঙ্গমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও। তিনি দেখিয়েছিলেন, সাধারণ ভাবে বিজ্ঞানের চর্চা কোনো অতীতের বিজ্ঞানীর তত্ত্বকে উন্নততর করার মাধ্যমে এগিয়ে চলে। যেমন টাইকো ব্রাহ্মের এক জীবনের বিপুল পর্যবেক্ষণকে সুত্রে গেঁথেছিলেন কেপলার আবার কেপলারের সূত্র থেকে তত্ত্বে পৌঁছান নিউটন। ভারতবর্ষে এই বিষয়টি লক্ষিত হয়নি। কোপার্নিকাসের বহু আগে আর্ভেট ঘোষণা করেছিলেন পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। গ্রহদের পর্যায়ক্রমিক গতির কথাও ভারতীয়দের জানা ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এদের মিলিয়ে কেউ আরও গবেষণা করেননি কিংবা এগিয়ে নিয়ে যাননি তত্ত্ব নির্মাণের পথে। বরং বাধা দিয়েছেন। আদর্শগত বিরোধ থেকে এবং পরীক্ষায় যাচাই হবার সন্তুষ্যতা না থাকায় কোনো মতবাদই সঠিক বলে নির্বাচিত হতে পারেনি। তাই সৃষ্টি হয়নি ইন্ডাস্ট্রিয়ালজিকের। সঠিক মতবাদকে একই আসনে সহাবস্থান করতে হয়েছে ভারতীয়দের সাথে। পরবর্তীকালে তাই ভুল তত্ত্বগুলি প্রাধান্য পেয়ে যায়।

আসলে বিচ্ছিন্ন ভাবে উন্নতি ঘটলেও বিজ্ঞান চর্চার একটি সার্বিক পরিমণ্ডল ভারতে গড়ে ওঠেনি। তাই নিউটন, লাইব্রেন্স, দেকার্ত যখন ইউরোপের বিজ্ঞান জগতে রাজত্ব করছেন, তখন ভারতে বলবার মত কোনো অবদান নেই। বঙ্গমচন্দ্রেরই মতো এ প্রসঙ্গে ব্যক্তি প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছিলেন “ভারতবর্ষের নাম বিজ্ঞানের মানচিত্র হইতে মুছিয়া গেল”। ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আক্ষেপ হল ধারাবাহিকতার অভাবে এর বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া। অত্যন্ত দ্রুতাগ্রের কথা এই যে সেই ইতিহাস ফুটে উঠেছিল যে মানুষটির কলমে সেই প্রফুল্ল চন্দ্রের বইটি নিয়েও ব্যতিক্রমী এক দুজন ভারতীয় ছাড়া কেউ বিশেষ চর্চা করেননি। অথচ বইটি বহু চর্চিত, বন্দিত হয়েছে ফ্রান্সে, ইতালিতে। আসলে দৃঢ় চরিত্রের বিজ্ঞানী প্রফুল্ল চন্দ্র সরাসরি সমালোচনা করেছিলেন ভারতীয় বেদান্ত দর্শন ও মায়াবাদকে। কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন শঙ্করাচার্য মতো দার্শনিককে। তাই সত্য সামনে দেখেও “প্রাচীন ভারতের সবই ভালো” মতে বিশ্বাসীরা সেসময়ে তাঁকে গ্রহণ করতে পারেননি।

প্রশ্ন হল, ভারতীয় জনমানস কি আজও প্রস্তুত, মিথ্যা প্রচারে বিশ্বাস হারিয়ে সে সত্য মানতে, যে সত্য আজ থেকে প্রায় এক শতাব্দী দুই দশক আগে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেছেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। “আমি কোনো মহাপন্ডিতের কথা উদ্ধৃতি করছি না, কিংবা শাস্ত্রে লিখিত কোনো সূত্রের উল্লেখও করছি না। আমি নির্ভীকভাবে কেবলমাত্র সেগুলোই লিপিবদ্ধ করছি যেগুলো আমি আমার অগ্রজগণের সামনে আমার নিজের হাতে করে দেখেছি। প্রকৃত শিক্ষক তারাই যারা শুধুমাত্র শিক্ষাদান করেন না, যা কিছু শেখান তা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেও দেখান। যোগ্য ছাত্র তারাই যারা, শিক্ষকের কাছে বিদ্যালাভের পর, নিজে নিজেই পরীক্ষাগুলি সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারে। বাকিরা মঞ্চাভিনেতা মাত্র”।

Source:

- আশীষ লাহিড়ী “প্রাচীন ভারত-বিজ্ঞানচর্চা-প্রফুল্লচন্দ্র”



প্রফুল্লচন্দ্র রায়: বিজ্ঞানী, শিক্ষক এবং পথপ্রদর্শক

বিভাবরী ঘোষ

(সেম-4, রসায়ন বিভাগ)

বিজ্ঞান আমাদের সমাজের স্থবিরতাকে নাড়া দেয়। ভাবতে শেখায়, ভাবা অনুশীলন করতে শেখায়। আর এই ভাবনার আলোড়ন থেকেই জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার আভাস পাওয়া যায়, সমাজের অচলায়তন এর নাগপাশ থেকে নিজেকে ও চারপাশের সবাইকে মুক্ত করে সুস্থ চেতনার উদযাপন করা যায়। এই উদযাপন করতে ও করাতে বাঙালিকে যিনি শিখিয়েছিলেন তাঁর নাম আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। যদি খুব ভালোভাবে তাঁর জীবন ও যাপন কে পর্যবেক্ষণ করা যায়, তাহলে আমরা বুঝতে পারি একজন প্রফুল্লচন্দ্র "বিজ্ঞানী" যিনি মারকিউরাস নাইট্রাইট আবিষ্কার করে অজেব রসায়নে যুগান্তকারী অবদান রেখেছেন, আর একজন প্রফুল্লচন্দ্র "লেখক" যিনি হিন্দু রসায়নের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে লেখালেখি করে বুঝিয়ে দিয়েছেন বিজ্ঞান দিয়েও সাহিত্য ব্যঙ্গনাকে অনুধাবন করা যায়, আবার আর একজন প্রফুল্লচন্দ্র "দ্রোণাচার্য", যিনি সত্যেন বোস, মেঘনাদ সাহার মত বীর বিজ্ঞানী তৈরি করে তোলেন, যাঁরা বিজ্ঞানের তৃনীরে চেতনার ব্রহ্মাঞ্চল দিয়ে বাঙালিকে আলোড়িত করেন। তাই তাঁকে যে কোনো একটি নির্দিষ্ট সত্ত্বার মধ্যে বেঁধে রাখলে, তাঁর জীবনের অতি সরলীকরণ করা হবে। যে সত্ত্বা গুলোর কথা বললাম সেগুলো হয়তো একটু খোঁজাখুঁজি করলে অনেক সুদক্ষ বিজ্ঞানী এবং গবেষক এর মধ্যে পাওয়া গেলেও যেতে পারে তবে এসব কিছুর উর্ধ্বে তাঁর আরেকটি সত্ত্বা ছিল, যেটা আমাদের শেখায় যে বিজ্ঞান শুধুমাত্র কিছু গবেষণা, জটিল সমীকরণ আর শিক্ষকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন।

যিনি প্রকৃত অর্থেই বিশেষ জ্ঞানের চর্চা করেন তিনি হয়তো সমাজকে ও সামাজিক সমস্যা গুলিকে বিভিন্ন প্রেক্ষণবিন্দু থেকে বিশ্লেষণ করতে জানেন এবং অপিচ, সেগুলির সমাধানের জন্য মানবিক ও সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাই সামাজিক দায়িত্ববোধ এ পরিপূর্ণ বাঙালী বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র ত্রাণ কার্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন 1923 সালে উত্তরবঙ্গের বন্যা ছুর্গত দের রক্ষার্থে। 1892 সালে তিনি আপার সার্কুলার রোডে একটি জায়গা ভাড়া নেন এবং সেখানে 700 টাকা পুঁজি নিয়ে বেঙ্গল কেমিকেল ওয়ার্কস শুরু করেন। উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি যুবকদের ব্রিটিশ কোম্পানির দাসত্ব করার বদলে স্বনির্ভর করা এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। হ্যাঁ, এভাবেও বিজ্ঞান ভাবতে শেখায়। বিজ্ঞান শুধু ভাবতে শেখায় না, লড়তে শেখায়, লড়াই করে বাঁচতে শেখায়, যেটা প্রফুল্লচন্দ্র বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যখন 1901 সালে প্রথম পুর্ণাঙ্গ pharmaceutical কোম্পানি হিসেবে শুরু হয় "বেঙ্গল কেমিক্যালস" এর পথ চলা। বাঙালিকে স্বতন্ত্র কর্মসংস্থান এর আস্থাদ দিয়েছিল যা। অতঃপর বেঙ্গল কেমিক্যালস এর ইতিহাস আমরা জানি। করোনার ওষুধ হাইড্রোক্লিনোরোকুইন তৈরিতেও সেই দেশী বিজ্ঞানীর তৈরি করে যাওয়া কারখানাকেই ভরসা করতে হয়। তাই ভাবতে হবে, ভাবা অনুশীলন করতে হবে। বিজ্ঞানী বা গবেষকের কাছ থেকে শুধু বিজ্ঞানের কিছু জটিল কারিকুরি

শিখলেই হবে না, তহুপরি সম্যক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সমাজকে উপলক্ষ্মি করতে শিখতে হবে যাতে বিজ্ঞান কে মানবিক হাতিয়ার করে, সমস্ত শৃঙ্খল বিমুক্ত করে বিকল্প চেতনা এবং বিকল্প ভাবনার উন্মেষ ঘটানো যায়। তবেই বিজ্ঞান ওই মোটা বইগুলো থেকে বেরিয়ে এসে বিশেষ জ্ঞান এ পর্যবসিত হবে। তাঁর এই আদর্শ ও নীতি গ্রহণ করে বাস্তবে রূপায়ন করাই আমাদের প্রধান কাজ। সেটা করতে পারলেই, তাঁকে সঠিক শুন্দা জানানো হবে।

৩

সাহিত্যানুরাগী বিজ্ঞানাচার্য

ভূমিকা প্রামাণিক

(সেম-4, রসায়ন বিভাগ)



গাল ভর্তি দাঢ়ি, আর মাথা ভরা চুল, লম্বা মুখ, আত্মভোলা আর ক্ষ্যাপাটে চেহারার আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, নামটা শুনলেই মনে পড়ে, টেস্টিটিউব, ল্যাব, গরুর অন্ধেষণ অর্থাৎ গবেষণা, মাস্টার অফ নাইট্রাইট, বেঙ্গল কেমিক্যাল, সব মিলিয়ে শুধুই বিজ্ঞান, বিজ্ঞান আর বিজ্ঞান! বিজ্ঞান আর সাহিত্যের জগৎকে আমরা বরাবর আলাদা ভাবে দেখতেই অভ্যন্ত। কিন্তু যুগে যুগে এই দুই জগতের গভীর মেলবন্ধনের ইতিহাস তো অল্প নয়। সেই মেলবন্ধনের অন্যতম দৃষ্টান্ত হলেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়।

আচার্যের বিজ্ঞানচর্চার সমন্বে সবাই কমবেশী অবগত হলেও, সাহিত্যপ্রেমী প্রফুল্ল চন্দ্রকে চেনে কত জন? বিশ্বকবি এই সাহিত্যানুরাগী বিজ্ঞানীর সমন্বে লিখেছিলেন "যেসব জন্ম সাহিত্যিক গোলমেলে ল্যাবরেটরির মধ্যে দুকে পড়ে জাত খুইয়ে বৈজ্ঞানিকের হাতে হারিয়ে গিয়েছেন তাঁদের ফের জাতে তুলবো। আমার এক একবার সন্দেহ হয় আপনি ও বা সেই দলের একজন হবেন।"

কলকাতার হেয়ার স্কুলে পড়াশুনার জন্য ভর্তি হলেও অসুস্থতার কারণে তাকে ফিরে যেতে হয় নিজের গ্রামে, বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা জেলার রাডুলি গ্রামে। গ্রামে ফিরে সেই সময়টা তিনি পিতা হরিশচন্দ্র রায়ের তৈরি লাইব্রেরিতে অতিবাহিত করতেন। বাঁধাধরা বইয়ের বাইরে, শেক্সপিয়ার, এমার্সন, কার্লাইল, ডিকেন্সের রচনা, নিউটন, গ্যালিলি ও, ফ্রাঙ্কলিনের জীবনী, বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি ইচ্ছেখুশি বই পড়ার আনন্দে মেতে উঠলেন তিনি। স্যর উইলিয়াম জোন্সের প্রশ্নের উত্তরে জোন্সের মায়ের উক্তি 'পড়িলেই সব জানিতে পারিবে' কথাটি প্রফুল্লচন্দ্রের মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করে।

প্রফুল্ল চন্দ্রের নিজের কথায় জানা যায়, ছোটবেলা থেকেই 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। সেখানেই পড়েছিলেন বঙ্গিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসটি। শেক্সপিয়র ছিলেন তার প্রিয় নাট্যকার। হ্যামলেট নাটক গোটাটা তিনি

মুখস্থ বলতে পারতেন। প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তাঁর আত্মচরিত গ্রন্থে লিখেছেন, "শেক্ষণপিয়রের সঙ্গে আমার পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল এবং বাল্যকালে আমি যেটুকু পড়িয়াছিলাম, তাহার ফলেই অমর কবির নাটকের প্রতি—
বিশেষতঃ, বিয়োগান্ত নাটকের প্রতি—আমার অনুরাগ বৃদ্ধি পাইল।"

আত্মচরিতে তাঁর স্কুলজীবনের স্মৃতি রোমন্থন থেকে জানা যায়, ভূগোল ও ইতিহাস এই ছুটি বিষয় খুব প্রিয় ছিল তাঁর।
স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় প্যারীচরণ সরকার ভূগোলের এবং মহেশচন্দ্র ব্যানাজি ইতিহাসের পরীক্ষক ছিলেন।
সহাধ্যায়ীদের মধ্যে তিনিই এই ছুই বিষয়ে সবথেকে বেশী নম্বর পেতেন। কবিতার প্রতি তাঁর অনুরাগ, এই জীবনীগ্রন্থ
থেকেই আমরা জানতে পারি। তিনি লিখেছেন "বিদ্যালয় গৃহের একটি ক্লাশের দেয়ালে গাঁথা মরফলকে ডেভিড
হেয়ারের সমিতির উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কয়েক লাইন ইংরাজী কবিতা আছে। উহা ডি, এল, রিচাড়াসনের রচিত। "Ah!
warm philanthropist, faithful friend, Thy life devoted to one generous end: To
bless the Hindu mind with British lore, And truth's and nature's faded lights
restore!" —হে পরোপকারী বিশ্বস্ত বন্ধু, তোমার জীবন একমাত্র মহৎ উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। সে উদ্দেশ্য,
ব্রিটিশ জাতির জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা হিন্দুজাতির মনকে জাগ্রত করা এবং সত্যের—তথা প্রকৃতির যে আলোক তাহাদের
মনে স্লান হইয়া গিয়াছে, তাহাকে পুনঃ প্রদীপ্ত করা। কবিতাটি আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল এবং এখনও আমি উহা
অক্ষরে অক্ষরে আবৃত্তি করিতে পারি।"

১৯১০সালে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন ও ১৯২০ সালে ভারতীয় বিজ্ঞানসভার সভাপতিত্ব
করেছিলেন তিনি। ১৯৩১-১৯৩৪ সময়কালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি পদে ছিলেন। চিন্মোহন
সেহানবিশের স্মৃতিচারণায় জানা যায়, প্রফুল্লচন্দ্রের ৭০তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেছিলেন স্বয়ং
রবীন্দ্রনাথ। আর সেদিন ঐ পুরোদস্ত্র বিজ্ঞানীর গলাতেও সবাই শুনেছিলেন 'পূরবী', 'বলাকা', 'কথা ও কাহিনী'
কাব্যগ্রন্থ থেকে অসংখ্য কবিতা। সম্পূর্ণ নিজের স্মৃতি থেকে মুখস্থ বলেছিলেন তিনি। সেই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,
তাঁর ভাষণে আচার্যের প্রতি শ্রদ্ধার্পন করে বলেন,—"আমরা দুজন সহযাত্রী। কালের তরীতে আমরা প্রায় একঘাটে এসে
পৌঁছেছি। কর্মের বর্তেও বিধাতা আমাদের কিছু মিল ঘটিয়েছে। আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন
জানাই। আচার্য নিজের জয়কীর্তি নিজেই স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে, পাথর দিয়ে নয় — প্রেম দিয়ে।
আমরাও তাঁর জয়ধ্বনি করি।"

রবীন্দ্রনাথ আচার্য রায়কে আশীর্বাদস্বরূপ হই ছত্র কবিতা একটি সুন্দর তাষ্টফলকে খোদিত করাইয়া দিয়েছিলেন।
কবিতাটি এই :

“প্রেম রসায়নে,
ওগো সর্বজনপ্রিয়,
করিলে বিশ্বের জনে আপন আত্মীয়।”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণের পরে, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "মাসিক বসুমতী" পত্রিকার ভান্ড ১৩৪৮ (অগস্ট ১৯৪১) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল "রবি-প্রয়াণ" নামক একটি কবিতা। কবির নাম ছাপা হয় "শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র রায়"। যদিও এই কবিই যে বিজ্ঞানাচার্য, তা সমন্বে কোনো তথ্য প্রমাণ না পাওয়া গেলেও পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে আচার্যের প্রফুল্লচন্দ্রের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক, এছাড়া সতীশচন্দ্রের পুত্রের অকালপ্রয়াণে এবং পরে সতীশচন্দ্রের মৃত্যুতে ওই পত্রিকাতেই 'আচার্য শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র রায়' নামেই প্রকাশিত শোকবার্তা দেখে, কবিতাটির কবির পরিচয় সমন্বে সন্দেহের অবকাশ থাকেনা। সেই কবিতাটির কিছু অংশ দিয়েই শেষ করি তবে,

" বাণীর আশিসে সোনার তুলিকা হাতে,
তুমি এঁকেছিলে সারদার মুখছবি;
মন-ভোলা গান গেয়েছিলে বীণা লয়ে,
মরমের কোণে সুখ-হুখ দিয়ে কবি!
তোমার 'সাধনা' দেবীর চরণতলে,
সার্থক শুধু তোমার পুণ্যবলে।
গভীর আঁধার মোদের ভুবন ঘিরে
ছুল-ছুল আঁখি, ভাসিছে অশুনীরে
তোমার পূজারী, দীনতার বেশে॥"

প্রফুল্লচন্দ্র: আমার আদর্শ

নাতাসা সুলতানা

(সেম-২, রসায়ন বিভাগ)



রসায়নের ছাত্রী আমি,
তোমায় কি করে ভুলি বলো?
হ্যাঁ, অধ্যাপক!
আমি তোমায় বলছি,
প্রফুল্লচন্দ্র!
চলে গেছ বহু দূরে,
তবু মিশে আছো
সবার রঞ্জে রঞ্জে।
যে বীজ তুমি করেছ বপন,

আজ তারই ফল

সকলে করছি গ্রহণ,

আমরা যে তোমারই অবতার!

মারকিরাস নাইট্রাইট আবিষ্কার,

প্রমাণ করলো তোমার মহিমা,

বিশ্বক্ষে ব্রিটিশ সুর্যের তীব্রতা অতিক্রম করে,

ভারত হলো আবারো আপন মহিমায় উন্নতশির।

বিজয় রথ তবু

থামেনি সেখানেই,

যৌগিক লবণ, থায়োএস্টার

একে একে কত কিছু যে হল আবিষ্কার!

ভারতকে বসালে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে।

শিকড়ের টান,

তোমায় ফেরালো দেশে,

বিপ্লবীরা পেলো রসদ, তোমারই অবদানে।

আমরা পেলাম তোমার দেওয়া উপহার,

বেঙ্গল কেমিক্যাল।

শিল্পায়ন এর

হলো অগ্রগতি।

বিজ্ঞানী হলে কি হবে!

জাতীয়তাবাদ যে ভুলবার নয়।

হলো তাই বাংলা ভাষার ব্যবহার

তোমার গ্রন্থে,

তোমার কথায়।

সি.আই.ই, নাইটে ভূষিত হলে তুমি।

আমরা পেলাম

অপার উৎসাহ,

সেই নতুন আণবিক কালচারে।

তোমাকে বানালাম আমার আদর্শ,

আর এগিয়ে চললাম

তোমারই দেখানো পথে।

যে পথে হেঁটে চলেছি আজও.....

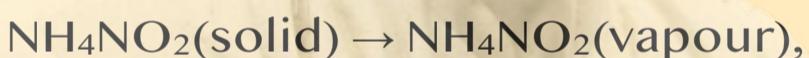
Prafulla Chandra Ray- “The Father of Indian Chemistry”

Akash Pal, Tirtha Chakrabarti and Esha Sinha

(3rd Year, Chemistry Department)

Prafulla Chandra Ray, a synthetic chemist and a resplendent figure of Indian Chemical Science, was one of the pioneers of chemical research in our country. He was introduced to research by Alexander Crum Brown, a notable chemist and teacher at Edinburgh University. A few years later he moved to the College of Science of Calcutta University as the first Palit Professor of Chemistry in the year 1916.

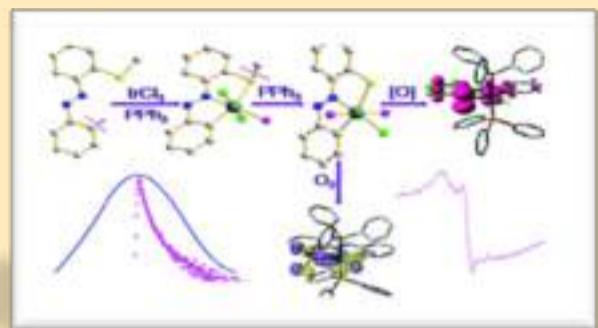
In 1895, he reported the synthesis of the mercurous nitrite $[Hg_2(NO_2)_2]$, which was then unknown due to the instability of mercury (I) towards disproportionation to mercury (II) and metallic mercury in solution. Dr. P. C. Ray found that upon heating to 70°C in moderate vacuum, a part of the ammonium nitrite also sublimes unchanged evidently via vaporization:



which led him to determine the vapour density of ammonium nitrite, which agreed very well with the calculated value, revealing that the salt remains in undissociated molecular form in the vapour phase, which further led him to determine the vapour densities of other ammonium salts as well. In 1912 when he visited UK, he presented the ammonium nitrite work at the Chemical Society in London. Nature magazine described it as “a further accomplishment in determining the vapour density of this very fugitive compound.”

Also, upon treating iridium tetrachloride ($IrCl_4$) with dialkyl sulfides (R_2S) in ethanol he found the metal to be reduced to the trivalent state forming a compound $[IrCl_3,3R_2S]$ isolated in two isomeric forms. On the basis of composition, stability and non-electrolytic nature of the yellow isomer in

acetone solution, he concluded that it is a hexacoordinated coordination compound of type $[\text{IrCl}_3(\text{Et}_2\text{S})_3]$ and suggested that the red isomer is also similarly constituted. He also studied the successful partial/complete replacement of Et_2S in yellow $[\text{IrCl}_3(\text{Et}_2\text{S})_3]$ by ammonia, pyridine and ethylamine. Later NMR spectral and other physical data convincingly demonstrated that yellow $[\text{IrCl}_3(\text{Et}_2\text{S})_3]$ had the mer geometry the red form was a dimerization isomer in the form of the 1:1 electrolytic salt $[\text{IrCl}_2(\text{Et}_2\text{S})_4] \cdot [\text{IrCl}_4(\text{Et}_2\text{S})_2]$, where both the cation and the anion have trans geometry.



His influence over the young minds gave birth to their inclination to study chemistry, leading to the establishment of the first school of chemistry in this country. Many did their doctoral work and worked on different projects under his able guidance. When he passed away on June 16, 1944, many of his grand-pupils, namely N. R. Dhar, J. C. Ghosh, J. N. Mukherjee, P. Ray, S. N. Bose and M. N. Saha. S. S. Bhatnagar wrote, “Sir Prafulla was more than anyone else responsible for the great development of scientific research in India during the past fifty years.”

P. C. RAY THE PATRIOT AND A SCIENTIST

 Prince Saha
(SEM-2, Chemistry Department)

Everyone knows his name. In India, he is regarded as “THE FATHER OF INDIAN CHEMISTS” and referred as the “ACHARYA”.

On 23rd August, 1907 Sri Aurobindo said-“If you study, study for her (The Mother’s-India’s) sake; train yourselves in body and mind for her sake. You learn your living so that you may live for her sake. You will go abroad to foreign lands

that you may bring back knowledge with which you may do service to her. Work that she may prosper. Suffer that she may rejoice." Acharya Prafulla Chandra Ray, followed each and every word of this advice and he was the person, who reminds us of the intense love for his country and his beloved disciples carried forward that love of their Acharya through various activities. Indeed, patriotism vibrated through every fiber of his being. This patriotism was "not loud but deep".

He was born on 2nd August 1861 in Khulna district in Bangladesh. He started his journey of life for our motherland. He came to Calcutta, as a teenager in 1879 to join Vidyasagar Collage because the great Nationalist leader (S. N Banerjee) was a teacher in that College. When literature and philosophy engrossed the attention of his contemporaries, Prafulla Chandra decided to go abroad to study science in spite of his deep fascination for literature and history, as he believed that the key to the country's progress was in the field of modern science and technology.

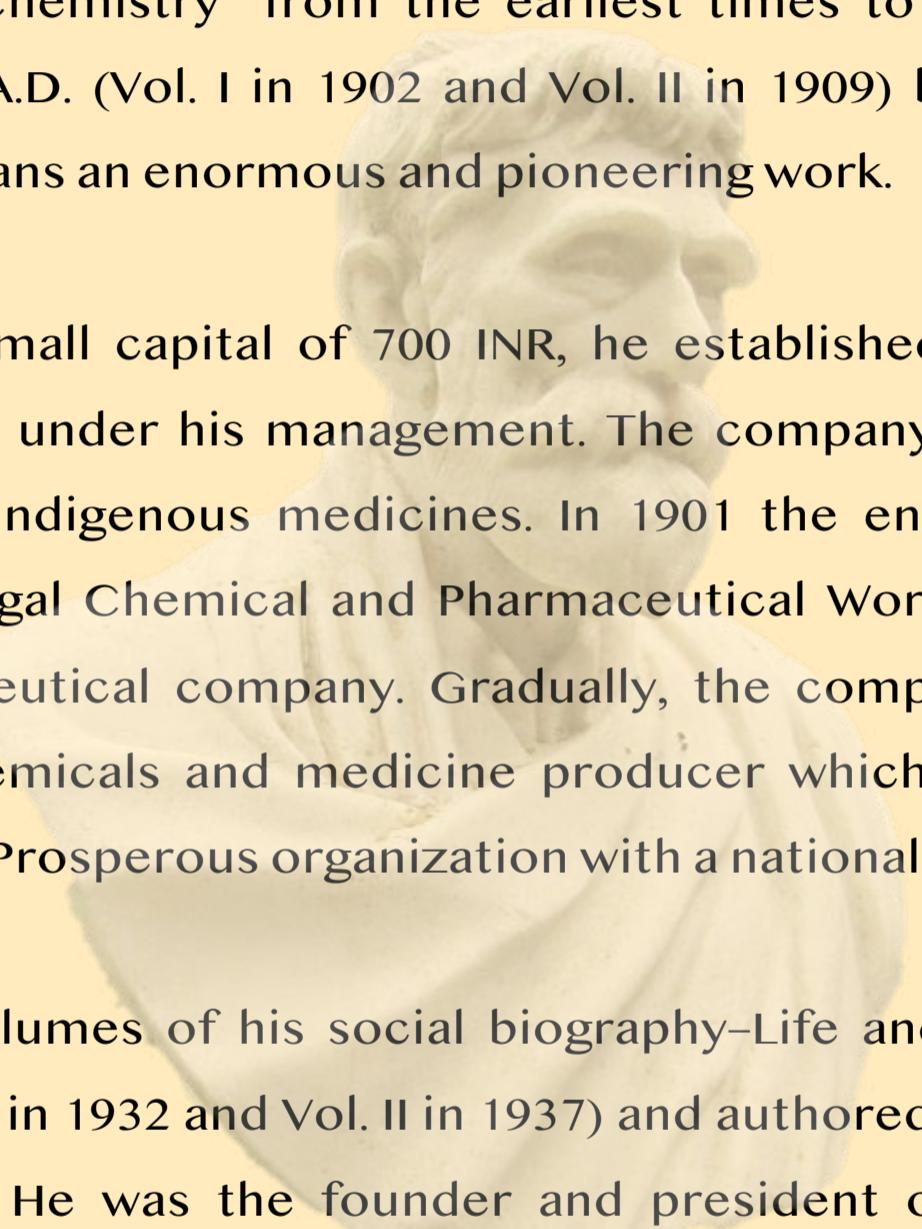
As a B.Sc. student at Edinburgh University, Prafulla Chandra demonstrated his intellectual courage and patriotic vigor when he took part in an essay competition on the topic "India before and after the Mutiny". That was highly critical of the British rule in India. From his essay three lines are worth mentioning:

- The lamentable condition of India at present is due to England's culpable neglect of, and gross apathy to, the affairs of that empire.
- A government which can squander 10,000,000 pounds on "palatial" barracks, but which cannot spare a farthing for laboratories, should forfeit the title of a civilized government.
- The Indian government is essentially a tax squeezing machinery and not a government for the people.

He passed the B.Sc. examination in 1885 and continued to do research. In 1887, he was awarded with the D. Sc. degree for his thesis on "Conjugated Sulphates of

Copper Magnesium Group: A study of isomorphous mixtures and molecular combinations". Since this thesis was judged as brilliant and best, he got the "Hope Prize" that allowed him to carry on research for one more year.

After that Prafulla Chandra returned and joined the chemistry department of the Presidency College in 1889 and stayed there for 23 years as a prominent teacher and researcher, publishing a large number of research papers mostly in reputed international journals. With the help of Haraprasad Shastri, he published "A History of Hindu Chemistry" from the earliest times to the middle of the seventeenth century A.D. (Vol. I in 1902 and Vol. II in 1909) based on extensive research and by all means an enormous and pioneering work.



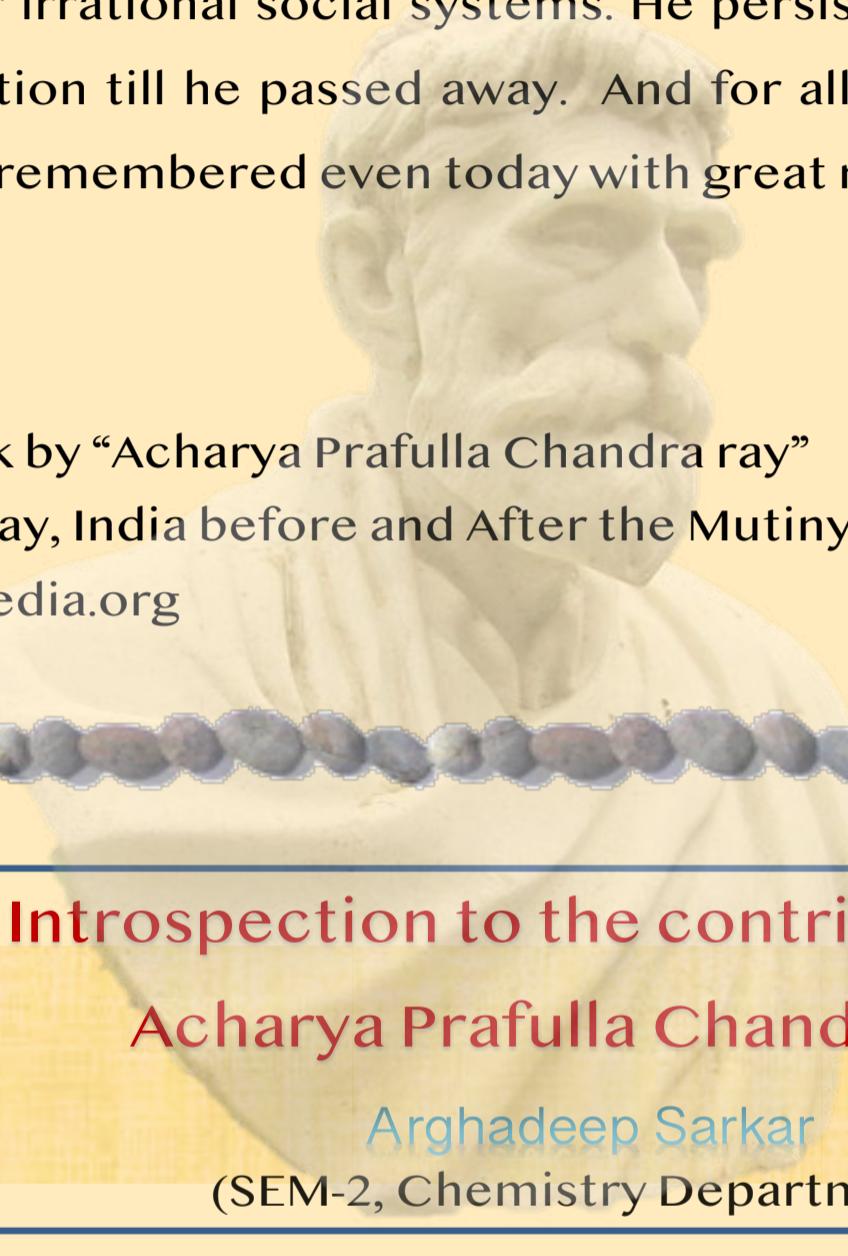
In 1892 with a small capital of 700 INR, he established Bengal Chemical Works, that flourished under his management. The company initially produced herbal products and indigenous medicines. In 1901 the enterprise became a limited company, Bengal Chemical and Pharmaceutical Works Ltd (BCPW) and India's first pharmaceutical company. Gradually, the company expanded and became a leading chemicals and medicine producer which acts as a modest dream to turn it into a Prosperous organization with a nationalistic outlook.

He completed two volumes of his social biography—Life and Experiences of a Bengali Chemist (Vol. I in 1932 and Vol. II in 1937) and authored numerous articles and a few textbooks. He was the founder and president of Indian Chemical Society (1924). He was referred to as "Father of Indian Chemists" for the nourishment and spiritual leadership he provided in the infancy of Indian chemistry. He was also referred as "Acharya" for his self-sacrifice, severity, ethical stand and love for the have-nots. Inclusive of the synopsis of his D.Sc. thesis, which is documented in the Proceedings of the Chemical Society (Edinburgh), the total number of research Publications was 158 till his death on 16th June, 1944.

Prafulla Chandra Ray wanted to use the marvels of science for lifting up the masses. He was a very passionate and devoted social worker and he participated eagerly and actively in helping famine and flood struck people in Bengal during the early 1920s. He promoted the khadi material and also established many other industries such as the Bengal Enamel Works, National Tannery Works and the Calcutta Pottery Works. He was a true rationalist and was completely against the caste system and other irrational social systems. He persistently carried on this work of social reformation till he passed away. And for all these great works in different spheres, he is remembered even today with great respect.

REFERENCE:

1. Aatmocharit, book by “Acharya Prafulla Chandra ray”
2. Prafulla Chandra ray, India before and After the Mutiny (1886)
3. <https://www.wikipedia.org>



Introspection to the contributions of Acharya Prafulla Chandra Ray

Arghadeep Sarkar

(SEM-2, Chemistry Department)



In 1922 when the Northern Bengal was triggered by devastating flash floods that made millions of people hungry and homeless, it was at this time when a benevolent devotee of science turned up and became a savior for many. He marshalled the Bengal Relief Committee and collected over 2.5 million rupees and distributed to the affected areas. He was none other than Acharya Prafulla Chandra Roy- the father of chemical science in India.

Apart from his contributions in the field of chemistry especially at inorganic chemistry at the time when research in organic was making waves, including his works on mercurous nitrite, ammonium and alkyl ammonium nitrites, Ray was acknowledged for his spirit of nationalism and his humanitarian approach towards his countrymen.

He believed that industrialization is the only solution to the socio-economic upheavals of India. He is also revered for his entrepreneurial and philanthropic spirit which he showed when he established Bengal Chemical and Pharmaceutical Works Ltd notwithstanding the oppositions and non-cooperation from the British government with a modest capital of Rs. 700 and about 1800 workers. The company then grew up under his leadership and also under eminent personalities like Dr. R G Kar, Dr. N. R. Sarkar, Dr. S P Sarbadhikari, Dr. Amulya Charan Bose. It provided the youth with employment opportunities.

Ray made his generous contribution towards the welfare of Sadharan Brahmo Samaj, Brahmo Girls' School and Indian Chemical Society. He also contributed Nagarjuna Prize for the best work in Chemistry. In 1937, he contributed for the establishment of another award named after Ashutosh Mukherjee for the best work in zoology or botany. Ray could have had a comfortable life and he could have settled abroad and worked in some of the best institutes, but he continued to contribute his part towards the progress of his motherland. When he turned 60, he donated all his salary for the department of Chemistry of Calcutta University and for research fellowships. He represented many universities at international seminars and congresses.

He breathed his last on 16th June 1944, but his scientific temperament, his thirst to install this scientific attitude to this countrymen, his autobiography Life and Experience of a Bengali Chemist and his literary work like A History of Hindu Chemistry continues to inspire many Indian Chemists and also speaks volumes about the glorious history of Ancient India.

References:

Book: রসায়নাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় – ডঃ বিমলেন্দু মিত্র;

Websites: <https://www.famousscientists.org/prafulla-chandra-ray>;

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Prafulla_Chandra_Ray



Prafulla Chandra Ray: ‘The Revolutionary in the Grab of a Scientist’

Rajdeep Chakraborty

(SEM-2, Chemistry Department)



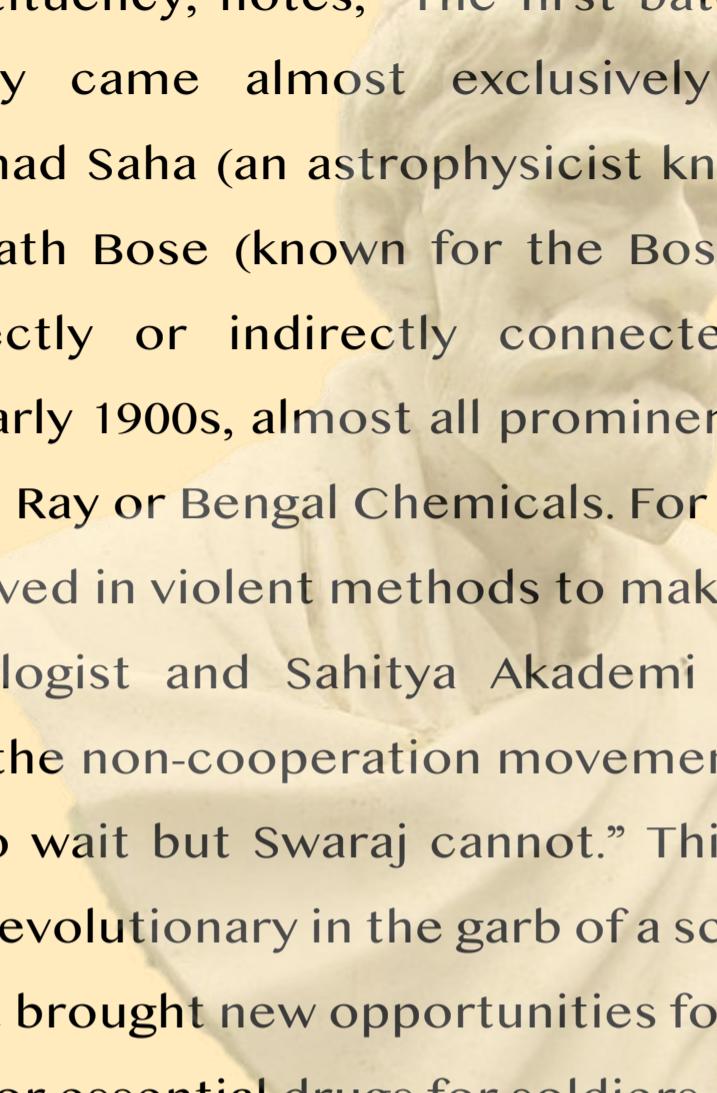
Prafulla Chandra Ray, a believer of the ideal that “industry, as a rule, precedes science,” was conscious of the impact in setting up of a factory would have on India’s knowledge reserve.

Following the rise in global demand for hydroxychloroquine, which is now being touted as a game-changer in the fight against the corona virus, Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd, is back in the spotlight for its production of a similar drug named chloroquine, which is also used for treating malaria. India has now received orders for hydroxychloroquine from several countries across the world. In a bid step up production, the PSU was issued a license to manufacture the drug by West Bengal’s Directorate of Drug Control. Established in 1892 with an investment of Rs 700, Bengal Chemicals was among colonial India’s first step towards self-reliance. With Dr Amulyacharan Bose, his student and a successful medical practitioner, Ray moved to create a thriving enterprise that would help to prevent an economic disaster by providing jobs to the younger generation.

It was, however, in a setting similar to April 2020 that resolved Ray to take the company to greater heights. Bose passed away on September 4, 1898, after contracting the bubonic plague, which killed millions around that time. “After Amulya’s death, I was left in sole charge of the work. It is enough to state here that

the ‘works’ was five years later converted into a limited liability company and in order that its expansive operations might be conducted on a much bigger scale, a plot of land measuring about 13 acres was secured,” writes Ray in his autobiography, *Life and Experiences of a Bengali Chemist*. In 1920, the company further acquired about 45 acres in Panihati in North 24 Parganas to set up another factory.

Although an entrepreneur, Ray led an austere life. *The Story of My Experiments with Truth*, Mahatma Gandhi in his autobiography, writes about Ray in the chapter, ‘A month with (Gopal Krishna) Gokhale’, whom he considered his guru. “He (Gokhale) would introduce me to all the important people that called on him. Of these the one who stands foremost in my memory is Dr. P. C. Ray this is how he introduced Dr Ray: ‘This is Prof. Ray, who having a monthly salary of Rs. 800, keeps just Rs. 40 for himself and devotes the balance to public purposes. He is not, and does not want to get, married. I see little difference between Dr. Ray as he is today and as he used to be then. His dress used to be nearly as simple as it is, with this difference of course that whereas it is Khadi now, it used to be Indian mill-cloth in those days.’ “While as a student at Edinburgh I found to my regret that every civilized country was adding to the world’s stock of knowledge but that unhappy India was lagging behind. I dreamt a dream that, God willing, a time would come when she too would contribute her quota,” he writes in his autobiography, content about how a new generation of scientists in the early twentieth century, primarily his students, led the Indian science renaissance. Although Ray seldom participated directly in the nationalist movement, owing to his job as a professor at then Calcutta’s Presidency College, he knew that without political independence, India’s economic progress would be unachievable. As a result, he sympathised with all political movements – be it of the moderates, the extremists, or the non-cooperation movement. His affection for both Mahatma Gandhi as well as Subhas Chandra Bose is well established through his writings.



In his book, *First Spark of Revolution*, Arun Chandra Guha of the revolutionary Jugantar Party, who was also a three-time Congress MP between 1952-67 from Bengal's Barasat constituency, notes, “The first batch of young scientists who gathered around, Ray came almost exclusively from the ranks of the revolutionaries. Meghnad Saha (an astrophysicist known for the Saha Ionization Equation), Satyendranath Bose (known for the Bose-Einstein condensate) and others were all directly or indirectly connected with the revolutionary organisation.” In the early 1900s, almost all prominent revolutionaries had some association either with Ray or Bengal Chemicals. For the cause of Independence, Ray helped those involved in violent methods to make bombs and supplied them with acid,” says Indologist and Sahitya Akademi awardee Nrisingha Prasad Bhaduri. It was during the non-cooperation movement in 1924 that Ray declared, “Science can afford to wait but Swaraj cannot.” This led the administration to record his name as a “revolutionary in the garb of a scientist”. However, it was the Second World War that brought new opportunities for Ray and Bengal Chemicals. “There was a demand for essential drugs for soldiers. A new plant and a pharmacy were installed at Panihati. Two production units were shifted to Lahore in 1942. And a factory was opened in Bombay in 1938”. It was following Ray’s death on June 16, 1944, that Bengal Chemicals entered a period of uncertainty, which was further worsened by Partition. Though it continued to produce drugs, the loss of market and non-realisation of outstanding debt took a toll. The company, which produced everything from chloroquine to naphthalene balls and “haturi marka (as strong as a hammer)” Phenyl-X, was nationalised in 1980. As of now, with a manufacturing licence in hand, Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd has started its production of hydroxychloroquin.

Reference:

- Book: Life and Experiences of a Bengali Chemist, autobiography, Acharya Prafulla Chandra Ray
- Websites: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Prafulla_Chandra_Ray
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bengal_Chemical

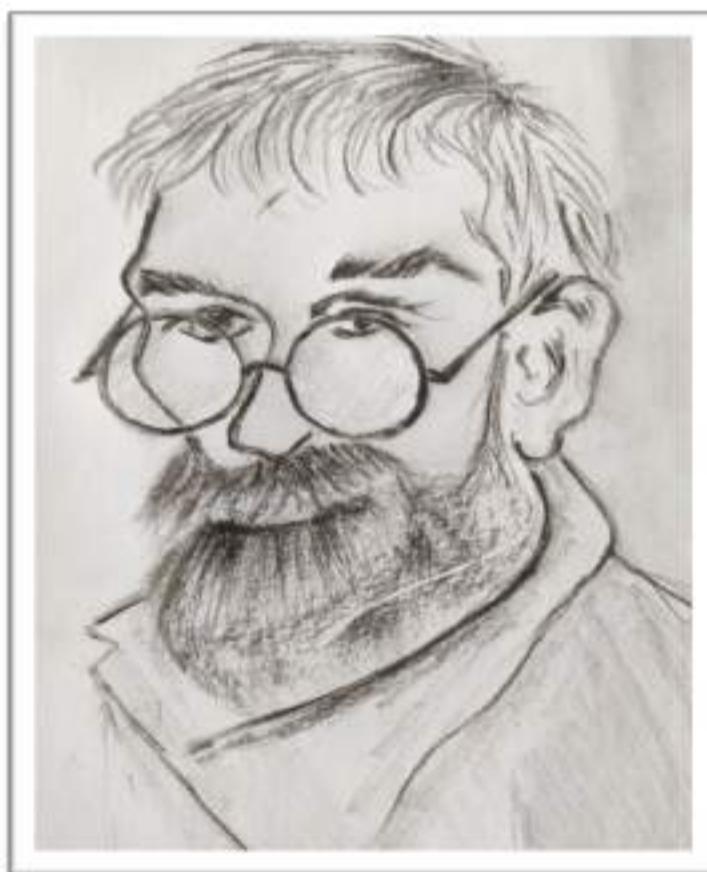
DRAWINGS BY THE STUDENTS



Drawing by Samik Mal (SEM-2)



Drawing by Sritama Chatterjee
(SEM-4)



Drawing by Shyamsundar Maity
(SEM-2)



Drawing by Suman Mahato
(SEM-2)